প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা

TARBIAH 1441 | 2020 | **ISSUE** 1

তারবিয়াহ

TARBIAH

সূচিপত্র



সম্পাদকীয়

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাম ও দরুদ আমাদের নবী, দুই জাহানের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা হকের অনুসারী থাকবেন তাদের উপর। আল-ফিরদাউস মিডিয়া ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে 'তারবিয়াহ' নামক ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। নিশ্চয় সাফল্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমাদের নিজেদের নিয়ত শুদ্ধ রেখে দ্বীনের জন্য কাজ করে যাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

হে মুসলিম ভাই-বোন,
সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা আপনাদের অজানা নয়। আরাকান থেকে জেরুজালেম, বিলাদুস শাম, ইরাক, আফগান, মালি কোথাও মুসলিমরা আজ ভাল নেই। মুরতাদ-কাফেররা নিত্য নতুন কারণ দেখিয়ে এই উম্মাহর উপর জুলুম ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিচ্ছে। উম্মাহর এই করুন অবস্থায় আপনাদের ন্যায় আমাদের অন্তরও রক্তাক্ত ও ব্যথিত।

হে প্রিয় ভাই-বোন,
উম্মাহর এই অবস্থা কিন্তু একদিনেই হয়নি। আমরা ইতিহাসে দেখি ১৯২৪ সালে খিলাফত ব্যবস্থার পতন হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কি এমন যে, ১৯২৩ পর্যন্ত আমাদের ঈমান আমল খুব শক্ত অবস্থায় ছিল, এরপর ১৯২৪ এ ইমান-আমলের অবস্থা খারাপ হবার কারণে হঠাৎ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই অপমান আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন? না ভাই। বাস্তবতা হল উম্মাহর এই ক্ষয় দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছিলো। আমাদের দীর্ঘদিনের গুনাহের ফলাফলই শেষে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কি এমন গুনাহ ছিল সেটা যার জন্য আল্লাহ আমাদের উপর কাফেরদের চাপিয়ে দিয়ে অপদস্থ করলেন?

মুসলিম উম্মাহর ভুল ছিল, উম্মাহ আমভাবে কাফেরদের প্রতিরোধ করা, এর জন্য চিন্তাভাবনা করা ছেড়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে কাফেররা তাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। যার ফলাফল ১৯২৪ এ আমরা দেখতে পেয়েছি। আফগানে তালিবান ভাইরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। ব্যাপারটা কি এমন যে হঠাৎ করে ২০২০ এ এসে আমেরিকানদের মনে হয়েছে যে, "আমরা আর যুদ্ধ করবো না। আমরা বাড়ি ফিরে যাবো"?

বাস্তবতা হল আমেরিকানরা চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এখন এই বিজয় কি এমনিতেই চলে এসেছে?
না। এর পিছনে রয়েছে বিগত ১৮ বছর ধরে উম্মাহের একটা অংশের ত্যাগ, সবর, বীরত্ব, হক্ব কে বুঝে এর উপর ইস্তিকামাত থাকার বিস্ময়কর ইতিহাস। আছে লাখো মানুষের নিজেদের জীবন আল্লাহর দ্বীনের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার শ্বাসরুদ্ধকর ইতিহাস। তাহলে ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, উম্মাহের অবস্থা যেমন একদিনে খারাপ হয় নি, তেমনি উম্মাহ আল্লাহর নুসরতও একদিনেই পাবে না। আল্লাহর দ্বীনের জন্য আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে উম্মাহকে একটি কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের ওয়াদা পরীক্ষা করে নিবেন।

এই কষ্টকর পরিস্থিতে দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত থাকার উপায় কি? ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, এই কষ্টকর পরিস্থিতি বা পরীক্ষার সময় দ্বীনের বুঝ যার যত শক্ত তিনি তত দৃঢ় থাকতে পারেন। এই বুঝ পাওয়ার উপায় কি? হক্বপন্থি উলামায়ে কেরামের অনুসন্ধান, তাদের থেকে নসিহত গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আমল দ্বারা এই বুঝ অর্জন করা সম্ভব। সর্বোপরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকট খুব করে দুয়া করা। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম উম্মাহর জন্য আমরা এমন কিছু হক্বপন্থি উলামায়ে কেরামের মূল্যবান কিছু লেখা আমাদের এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি। এখানে যা কিছু ভাল তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আর-রাদ ১১)

আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য পাওয়ার উপযোগী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের জন্য দ্বীন কে বুঝা ও দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকা সহজ করুন। উপকারী ইলম অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন।

আল্লাহ আমদের ভাইদের কে হেফাযত করুন। আমাদের মুরুব্বী, উলামায়ে কেরাম ও তানজিমকে কবুল করে নিন। আল্লাহ ভাইদের কুরবানি গুলো কবুল করুন।

আমীন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস



গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দোয়া ও তার ফযিলত

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়িদিল আম্বিয়া-ই ওয়াল-মু-রসালীন, ওয়া আলা আলিহী, ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। আম্মা বা'দ আমরা সকলেই প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়ে নিই।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

আলহামদুলিল্লাহ এক সপ্তাহ পর আবার আমরা আরেকটি তাযকিয়া মজলিসে হাজির হতে পেরেছি, এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ।

একটি দোয়া

গত মজলিসে বলেছিলাম, হাদীসে যেসব দোয়া এসেছে ওগুলো দুই ধরণের। কিছু দোয়া এমন যেগুলো নির্ধারিত কোন সময়ের সাথে বাঁধা নয়। যে কোনো সময়ই পড়া যায়। আর কিছু দোয়া আছে এমন যেগুলো পড়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া আছে। যেমন, ফরয নামাজের পরবর্তী দোয়া, সকাল-সন্ধ্যার দোয়া, ঘুম থেকে জাগ্রত হবার দোয়া, ঘুমানোর দোয়া, সফরের দোয়া ইত্যাদি।

গত মজলিসে আমরা প্রথম প্রকারের একটি দোয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা দ্বিতীয় প্রকারের কয়েকটি দোয়া নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমেই আমি এ সংক্রান্ত একটি হাদীস পেশ করছি, যে হাদীসে এমন একটি দোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কোন মুসলমান সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিনবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়লে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করে দেবেন। দোয়াটি হল,

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ : ১৮৬৭১)

দোয়াটিতে মোট তিনটি অংশ রয়েছে। চলুন, প্রতিটি অংশ নিয়েই সামান্য কিছু আলোচনা করি ইনশাআল্লাহ, যেন দোয়াটির মর্ম আমাদের আত্মস্থ হয়ে যায়।

দোয়ার প্রথম অংশ

দোয়ার প্রথম অংশ হল, رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। এর অর্থ হল, আলহামদুলিল্লাহ আমি সন্তুষ্ট এই জন্য যে, আমার রব হলেন আল্লাহ। আমি আমার রবকে চিনতে পেরেছি। তাঁর ওপর ঈমান আনতে পেরেছি। তিনি আমাকে তাঁর পরিচয় জানিয়েছেন। তাঁর রুবুবিয়্যাতের ওপর ঈমান আনার তাওফিক দিয়েছেন। তাঁর রুবুবিয়্যাতের হক কী, তা আমাকে জানিয়েছেন। আমি কীভাবে তাঁর শোকর আদায় করব সে পদ্ধতি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

দোয়ার দ্বিতীয় অংশ

দোয়ার দ্বিতীয় অংশ হল, وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا আমি ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আলহামদুলিল্লাহ আমি সন্তুষ্ট এই জন্য যে, ইসলাম আমার দ্বীন। ইসলাম আমার ঈমান ও আকিদা। ইসলাম আমার শরিয়ত ও জীবনব্যবস্থা। আমার রব আমাকে ইসলামের হেদায়েত দিয়েছেন। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তা আমাকে বুঝার তাওফিক দান করেছেন। আমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল অবিচল থাকবো। ইসলামের উপরই বাঁচবো। ইসলামের উপরই মরবো। আমার ছোট বড় সকল আমল, আমার জীবন, আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য। কুরআনে কারীমের ভাষায়,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَه وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনও শরিক নেই। আমাকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের তথা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণকারীদের একজন। (সূরা আন'আম : ১৬২)

দোয়ার তৃতীয় অংশ

দোয়ার তৃতীয় এবং শেষ অংশ হল, وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًا আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আলহামদুলিল্লাহ আমি সন্তুষ্ট এই জন্য যে, আমার নবী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাকে তাঁর উপর ঈমান আনার তাওফিক দিয়েছেন। তাঁর উপর নাযিলকৃত শরিয়তের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার তাওফিক দিয়েছেন। তাঁর ছোট বড় প্রতিটি সুন্নাহ ও আদর্শ আমার সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর শরিয়তের ছোট বড় প্রতিটি বিধান, ঈমান ও আকিদা থেকে নিয়ে নফল ও মুস্তাহাব পর্যন্ত সব কিছু সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

এ উপদেশগ্রন্থ আমিই নাজিল করেছি এবং আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী। সুরা হিজর : ৯

দোয়াটি করার সময় দোয়ার এই মর্মগুলো আমরা অন্তরে হাজির রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এ দোয়াটির মতো হাদীসে এমন আরও অনেক দোয়া ও আযকার এসেছে যা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে বাঁধা। ওই সব দোয়া ও আযকারের মধ্য থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় পড়তে হয় এমন বিশেষ কয়েকটি দোয়া ফযিলতসহ পেশ করছি। এ দোয়াগুলো আমাদের জন্য খুবই উপকারী। দোয়াগুলো আমরা অবশ্যই পড়ব এবং পড়ার সময় ওগুলোর ফযিলতটাও অন্তরে হাজির রাখার চেষ্টা করব। তাহলে এ দোয়াগুলো আমাদের অন্তরে আলাদা একটা প্রভাব ফেলবে ইনশাআল্লাহ

আয়াতুল কুরসী

اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَه مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আল্লাহ তিনি যিনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। তাঁকে কখনও তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশমন্ডলে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সব কিছু তাঁরই। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি সবার সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে সবই জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই নিজের আয়ত্বে নিতে পারে না, কেবল ততটুকু ছাড়া যা তিনি নিজে ইচ্ছা করেন। তাঁর 'কুরসী' আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর বিন্দু মাত্রও কষ্ট হয় না। তিনি সুউচ্চ সুমহান। (সূরা বাকারা : ২৫৫)

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ أُجِيْرَ مِنَ الْجِنِّ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ أُجِيْرَ مِنْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ

কেউ সকাল বেলা আয়াতুল কুরসি পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিনদের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। সন্ধ্যাবেলা পড়লে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৫৬২

অন্য হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ لَمْ يَمْنَعْه مِنْ دُخُولِ الجَنّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ

কেউ প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পড়লে তার জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোনও বাধা থাকে না। নাসায়ী, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ : ১০০

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ.

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন সামাদ। (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী) তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও কারও থেকে জন্ম নেন নি। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (সূরা ইখলাস ১-৪)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

বলুন, আমি আশ্রয় কামনা করছি ঊষার রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায় এবং সে সমস্ত নারীদের অনিষ্ট থেকে যারা (সূতার) গিরায় ফুঁ দেয় এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক ১-৫)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

বলুন, আমি মানুষের রব, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহের নিকট আশ্রয় কামনা করছি, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে; যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, সে জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা নাস ১-৬) - সুনানে আবূ দাউদ : ১৫২৩; জামে তিরমিযী : ২৯০৩

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي كَفَتْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

কেউ সকাল-সন্ধ্যা তিন তিন বার এ তিনটি সূরা পড়লে এ সুরাগুলো তার জন্য সবকিছুর অনিষ্ট থেকে যথেষ্ট হবে। সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৮২; জামে তিরমিযী : ৩৫৭৫

সব কিছুর ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا إِذَا أَصْبَحَ، وَثَلَاثًا إِذَا أَمْسَى لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ

কেউ সকালে তিন বার এবং সন্ধ্যায় তিন বার এ দোয়া পড়লে কোনও কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। সুনানে আবু দাউদ : ৫০৮৮; জামে তিরমিযী : ৩৩৮৮; মুসনাদে আহমদ : ৪৪৬

সাইয়িদুল ইস্তিগফার

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া আর কোনও ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমতো আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে যে সব নিয়ামত দিয়েছেন তা স্বীকার করছি। আর আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া আর তো কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا مُوْقِنًا بِهَا حِيْنَ يُمْسِي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَكَذَالِكَ إِذَا أَصْبَحَ

কেউ পূর্ণ একিনের সাথে সন্ধ্যায় এটি পড়লে ওই রাতে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সকালে পড়লে ওই দিন মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সহীহ বুখারী : ৬৩০৬

দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা কামনা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন দোষগুলো ঢেকে রাখুন। আমার ভীত সন্ত্রস্ততাকে নিরাপত্তায় পরিণত করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, উপরের দিক থেকে (মোটকথা সব দিক থেকে) রক্ষা করুন। আর আমি আপনার বড়ত্বের ওসিলায় নিচের দিক থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ দোয়াটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যায় পড়তেন। সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৭৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৭১

বিষধর প্রাণীর ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওসিলায় তাঁর নিকট তাঁর সকল মাখলুকের ক্ষতি থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

কেউ সন্ধ্যায় তিন বার এ দোয়াটি পড়লে ওই রাতে কোনো কিছুর বিষ তার কোনও ক্ষতি করবে না। মুসনাদে আহমদ : ৭৮৯৮ নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৫৯০

হযরত খাওলা বিনতে হাকীম আস-সুলামিয়াহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ কোথাও অবতরণ করে উপরের দোয়াটি পড়লে সেই জায়গা ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। জামে তিরমিজী : ৩৪৩৭; সুনানে মাজাহ : ৩৫৪৭

দশটি দাসমুক্তির সওয়াব

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনও ইলাহ নেই, তাঁর কোনও শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

ফযিলত : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَه ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

কেউ দিনের বেলা একশ বার এ দোয়াটি পড়লে দশটি দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। তার নামে একশটি সওয়াব লেখা হবে। একশটি গোনাহ ক্ষমা করা হবে। সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। (কেয়ামতের দিন) তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসবে না। যদি না কেউ এ দোআটি তার চেয়ে বেশি পড়ে। সহী বুখারী : ৩২৯৩; সহী মুসলিম : ২৬৯১

সকাল সন্ধ্যায় পড়ার জন্য এমন আরও অনেক দোয়া বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন কিতাবও আছে। 'হিসনুস মুসলিম' নামে বাজারে একটি কিতাব পাবেন। ওই কিতাবে থাকা সবগুলো দোয়াই নির্ভরযোগ্য। এ ছাড়া 'হাদিসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকির' এ নামে ছোট একটি বইও আছে। তো সকাল সন্ধ্যার সবগুলো দোয়াই আমরা পড়ব এবং পড়ার সময় অবশ্যই দোয়ার অর্থ ও মর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তাহলেই এ দোয়াগুলোর মাধ্যমে আমরা অন্তরে অন্য রকম এক ঈমানি তৃপ্তি ও স্বাদ অনুভব করব ইনশাআল্লাহ। হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً». رواه مسلم

হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, ওই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পায়, যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। সহী মুসলিম

হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, ঈমানেরও স্বাদ আছে, মজা আছে, মিষ্টতা আছে, যা শুধু সত্যিকারের মু'মিনরাই অনুভব করতে পারে। পাশাপাশি এও বুঝা যায় যে, ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা একমাত্র সে-ই অনুভব করতে পারে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

আজকে আমরা যে হাদীসটি দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করেছিলাম সেই হাদীসটি আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কোন মুসলমান সকাল-সন্ধ্যা তিন তিনবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়লে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করে দেবেন। দোয়াটি হল,

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। মুসনাদে আহমাদ : ১৮৬৭১

দোয়াটি পড়ার সময় এর যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপরে পেশ করা হয়েছে তা আমরা অন্তরে হাজির রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম ভাইয়েরা! আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং ইখলাসের সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমরা সকলে মজলিস থেকে উঠার দোয়াটা পড়ে নিই।

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



স্বাধীন কে?

মূলঃ আমের সালীম খাঁন
অনুবাদঃ মাওলানা যুবায়ের

এই লেখা একজন ঈমানী আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির লেখা যিনি পাকিস্তানী নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ঈমানী আহবানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ছেড়ে জিহাদি কাফেলায় শরিক হয়েছেন।

আমাদের দেশে স্বাধীন কে?

আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তিই স্বাধীন - যে যখন-তখন, যেখানে-সেখানে, যার উপর ইচ্ছা তার উপরে ড্রোন বিমান দিয়ে আক্রমণ করে তার জান নিয়ে নেয় এবং তাকে জিজ্ঞাসা করার মতো ও কেউ থাকেনা, কারো এই সাহস হয় না যে তার থেকে হিসাব নিবে।

আমাদের দেশে স্বাধীন ঐ ব্যক্তি যে, কাউকে উঠিয়ে নিয়ে নিজের কাছে বা কোন পরিত্যক্ত দ্বীপে(গোয়ান্তানামো) বন্দি করে রাখে। তাকে বাধা দেওয়ার মত কেউ থাকেনা। একাজের জন্য তাঁকে জবাবদিহি ও করতে হয় না। যেমন; আমাদের বোন আফিয়া সিদ্দীকীকে তার নিজ শহর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। একইভাবে আমাদের দেশ থেকে হাজারো মুজাহিদ ভাইদেরকে গ্রেফতার করে গোয়ান্তানামোতে বন্দি করে রেখেছে।

আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তিই স্বাধীন যে, আমাদের দেশের জন্য নির্ধারিত অন্য একটি বন্ধু ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে গ্রেফতার করে। এরপর তাকে বিবস্ত্র করে নিজ বিমানে উঠিয়ে নিজ জেলখানায় নিয়ে বন্দি করে রেখেছে। অথচ এই জঘন্য কাজ করা সত্ত্বেও তাকে কেউ তিরস্কার করতে পারেনি।

আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তি স্বাধীন যে অনেক দূরের দেশ থেকে এসে, আমাদের দেশে স্বাধীন ভাবে ঘুরাফেরা করে। এরপর যাকে মনে চায় নিজ অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে ফেলে। জি হ্যাঁ আমাদের দেশে তদন্ত কারী পুলিশেরা স্বাধীন, যারা যে কাউকে হত্যা করে নিরাপদে নিজ ঘরে চলে যায়।

আমাদের দেশে সে স্বাধীন যে, যে কোন জায়গায় স্বীয় চিম্বুক হেলিকপ্টার উড়িয়ে অতর্কিত হামলা চালাতে পারে, লোকদের ঘরে ঢুকে যেতে পারে, এবং যে কাউকে হত্যা করতে পারে। সেই জায়গাটা যদিও এ্যাবোটাবাদের মতো কোন জায়গায় হয় তবুও তার নিস্তার নেই। আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তি স্বাধীন যার পরিপূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে যে,

আমাদের দেশের যে কোন বিমান ঘাটিকে নিজের বিমান ঘাটি বানিয়ে নিবে। এই বিমান ঘাটিতে নিজের বিমান গুলো, ড্রোনগুলো মোতায়েন করে রাখবে। এই বিমান ঘাটি থেকে সে যখন ইচ্ছা নিজ বিমান উড়িয়ে মুসলমানদের উপর বোম্বিং করবে। যেমন কাবায়িলি পুরাতন জিহাদি পার্টির উপর বৃটেনের যুদ্ধ জাহাজগুলো বোম্বিং করেছিল এবং বর্তমানে আফগান যুদ্ধে আমাদের দেশ থেকে সাতান্ন হাজার বার মার্কিন যুদ্ধ বিমান যেয়ে বোম্বিং করে এসেছে।

আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তি স্বাধীন যার কাছে আমাদের স্থলপথ, আকাশপথ, সমুদ্র এবং বন্দরসমূহের এখতিয়ার রয়েছে। তারা নিজ প্রয়োজনে যখন ইচ্ছা এগুলো ব্যবহার করতে পারে। তাদের যুদ্ধ সরঞ্জামগুলো আমাদের সামুদ্রিক রাস্তা দিয়ে করাচী বন্দরে আসে। তারপর সেখান থেকে প্রকাশ্যে আমাদের দেশের সড়ক দিয়ে কোন ধরণের বাঁধা ব্যতিত একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যায়।

আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তিই স্বাধীন যার সাপ্লাইগুলো সমুদ্রে আমাদের নৌবাহিনী এবং সড়ক পথে আমাদের স্থলবাহিনী হেফাজত করে।

আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তি স্বাধীন যে, যেকোন জায়গায় আমাদের বাহিনীকে মোতায়েন করে তাদের দ্বারা অপারেশনের নামে আমাদের জনসাধারণকে ব্যাপক ভাবে হত্যা করতে পারে। তারা মসজিদ সমূহকে শহিদ করে, বস্তি গুলোকে উজাড় করে জনসাধারণকে গৃহহীন করে দেয়। তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে ক্যাম্পসমূহে জীবন যাপনে বাধ্য করে।

আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তি স্বাধীন যে, আমাদের সেনাবাহিনীকে বাহবা দেয় নিষ্পাপ শিশুদেরকে ফসফরাস বোমা দিয়ে ভস্ম করার কারণে। হ্যাঁ আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তিই স্বাধীন যে, আমাদের সেনাবাহিনীকে কোয়ালিশন সাপোর্ট দিয়ে এসব কিছু করায়।

আমাদের দেশে ঐ ব্যক্তি স্বাধীন যে, আমাদের দেশের পলিসি বানাতে সক্ষম। তিনি আন্তর্জাতিক মার্কেটে আমাদের দেশের নোটের(টাকার)মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। যদি মন চায় তাহলে প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো করে দেন, আবার মন চাইলে নষ্ট করে দেন। তিনি চাইলে আমাদের দেশর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক, আর তিনি না চাইলে রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে একনায়কতন্ত্র। তিনি আমাদেরকে আর্থিক সাহায্য না করলে আমাদের দেশ দেউলিয়া হয়ে যাবে!! তিনি কাশ্মীরের ব্যাপারে শুধুমাত্র সালিশের কথা বললেই কাশ্মীরের ব্যাপারে আমাদের দেশের অবস্থান দৃঢ় হয়ে যায়।
সে আমাদের F-16 উড়োজাহাজকে উপরের গ্রেডে নির্ধারণ না করলে সেটা নিচের গ্রেডে চলে যায় এবং তা শত্রুর বিরুদ্ধে কাজের উপযুক্ত থাকে না।

জি হ্যাঁ! আমাদের দেশে এই লোক স্বাধীন।
এই দেশে আর কে স্বাধীন?
যে তাদের গোলাম সে স্বাধীন। তাদের গোলাম কিভাবে স্বাধীন? সে এভাবে স্বাধীন যে - যখন চায় কাউকে গুম করে ফেলে, যে কাউকে নিজের গোপন টর্চার সেলে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানায়। যে কাউকে মেরে সড়কে লাশ ফেলে দেয়। সে চাইলে তার মন মত সরকার নিয়ে আসবে। প্রতিরক্ষার নামে বাজেটের থেকে সবচেয়ে বড় অংশটা নিজের নামে করে নিবে। এতে দেশের দারিদ্রতার স্তর ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্তরেই থাকুক না কেন? সে চাইলে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদেরকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ফায়সালা করতে বাধ্য করবে। যদি কেউ তা মেনে না নেয় তাহলে তার সাথে বিচারপতি শওকত আজীজ সিদ্দিকির সাথে যেমন আচরণ করা হয়েছে তেমন আচরণ করবে। সে ইচ্ছা করলে সিনেটের ভোট কিনে নিবে এবং নিজের মনমত লোক চেয়ারে বসিয়ে রাখবে।

সে ইচ্ছা করলে ওলামায়ে কেরামদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কতক লোকের মাধ্যমে নিজের মর্জি মত ফতওয়া প্রকাশ করবে। আর যদি কোন আলেমে রাব্বানী হক বয়ান করেন তাহলে তিনি তাদের গুলি এবং বর্শার লক্ষ্যবস্তু হয়ে যান।

হ্যাঁ ঐ সকল লোকেরা স্বাধীন যাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিডিয়া একটি শব্দও প্রচার করতে পারেনা। যদি করে তবে তাদের ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। আর যাদের ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দেয়া হয় তাদের এই ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা বা বলার কোন সাহস নেই। সবশেষে চ্যানেলওলারাই উল্টা ক্ষমা চাইবে। এইদেশে তাদের মর্জির মত যে সকল সাংবাদিকরা চলে তারা দেশপ্রেমিক। বাকিরা দেশের দুশমন।

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।
তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে।
তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। ▪ সূরা আহযাব-২৩





দাওয়াতের পদ্ধতি

এবং জিহাদি মানহাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও তার সংরক্ষন।

১ম পর্ব

মূলঃ উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ
অনুবাদঃ সৈয়দ সাফকাত ওয়াসি

মূলত এই আলোচনা করা হয়েছে ইন্টারনেট সহ সর্বমহলের জিহাদের পথে আহবান কারী দা'য়ীগণকে লক্ষ্য করে।

কিছু পদ্ধতি এমন যা দাওয়াতের জন্য ক্ষতিকর!

এবিষয়ে আলোচনা করার আগ্রহ তৈরী হয়েছে ইন্টারনেটে জিহাদের প্রতি দাওয়াত বিষয়ক কিছু পেইজ দেখে। এসকল পেইজের পরিচালক-গণ একদিকে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কারণ তারা এই চতুর্মুখি ফেতনার সময়ে জিহাদের দিকে দাওয়াতের ঝান্ডা উঁচু করে বাতিলের বিরোধিতা করছে। এমনকি তারা এই বাতিল শাসনব্যবস্থা দূর করার উপায় একমাত্র জিহাদকেই সাব্যস্ত করেছে। এদিক থেকে তাদের যত প্রশংসাই করা হোক না কেন তা কম হবে। কারণ, বর্তমানে যেখানে 'যামানার ফেরাউনদের' অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার এবং তাদের মন জয় করার জন্য বড় বড় ব্যক্তিরাও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, সেখানে এই ভাইয়েরা জালেমদের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে, নিজেদের জান হাতে নিয়ে তাদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে।

সেইসাথে জিহাদের দাওয়াতের বিরোধিতাকারীদেরকে তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া খন্ডন দেখে তাদের ইখলাসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভাইদের ইখলাসের সামনে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা ঝুঁকে যায়। কিন্তু তার পরিণতি দেখে অতি আফসোসের সাথে বলতে হয় - এই সম্মানিত ভাইদের কারো কারো দাওয়াতের পদ্ধতি ও খণ্ডনের তরিকা মোটেও সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কাফেরদের সাথে পর্যন্ত হেকমত, উত্তম নসিহত ও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আলোচনা-পর্যালোচনা ও মুনাযারা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফেরাউনের সাথে পর্যন্ত দাওয়াতের ক্ষেত্রে নরম ব্যবহারের তাকিদ করেছেন।

কিন্তু এসমস্ত পেইজে কি আম কি খাস, উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকদের ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠিন এবং বিদ্রুপাত্মক কথা লেখা হয়। যেই সমস্ত মতবিরোধকারীদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টার দরকার ছিলো, তাদেরকে এমনভাবে সম্বোধন করা হয় যাতে কোন ধরনের সহানুভূতি ও কল্যাণকামীতার ঘ্রাণও থাকে না।

যে কোন মুসলমানকেই নিন্দা করা, বিদ্রুপ করা, অভিশাপ দেয়া হারাম। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন এটাই এক্ষেত্রে দাওয়াতের আসল পদ্ধতি। যে ব্যক্তি একশতে একশ আমার মত সমর্থন করবে সে আমার আপন, আর যে সামান্য একটু বিরোধিতা করবে সেই দুশমন!!! তার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ! তাকফিরে মুআয়্যিন (তথা নির্দিষ্টভাবে কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা) এর কাজ যা গভীর ইলমের অধিকারী, বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞার অধিকারী আলেমদের কাজ, এখানে তা খুব হালকাভাবে দেখা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের উপর খুব সহজেই কুফুরির ফতোয়া দিয়ে দেয়া হয়। এখানে বিরোধিতাকারী দ্বীনদারদের প্রতি কল্যাণকামীতা নেই, কোন হারাম কাজে সতর্ক করেই ক্ষান্ত হওয়া নেই। আছে শুধু গালিগালাজ, নিন্দা, বিয়ে ভেঙে যাওয়ার হুমকি এবং তাদের সরাসরি ক্ষতি করার চেষ্টা। তাদের ব্যাপারে এমন এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা মুখে আনাও অসম্ভব। নব্য মুরজিয়া, ধর্মীয় হিজড়া এমন আরও অশ্রাব্য কথাবার্তা!!

ইয়া আল্লাহ! এ কেমন দাওয়াত!!? এরা কীভাবে মনে করে যে, তাদের

দ্বারা ইসলামের কোন খেদমত হতে পারে! দাওয়াতের এ পদ্ধতি আই. এস এর আত্মপ্রকাশের পূর্বেও অনেক জোরেশোরে চালু ছিলো। যখন আই. এস আত্মপ্রকাশ করল তখন জিহাদের পথে আহ্বানকারী এই সকল দা'য়ীগণ এই ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে এর প্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিরাও এই ফেতনায় লিপ্ত হয়ে গেলো। খুব কম সংখ্যক লোকই প্রকাশ্যে এই খারেজীদের দলভুক্ত হওয়া থেকে মুক্ত ছিল।

বাস্তবতা হলো দাওয়াত ও জিহাদের সফরে কলব যখন ইনসাফ থেকে সরে যায় - তখন বিনয় অহংকারে, ভাষার শালীনতা অশালীনতায় রূপান্তরিত হয়। এবং অন্তরের নম্রতা কাঠিন্যতার রুপ ধারণ করে। তারপর সে ব্যক্তি নিজেও গোমরাহির পথে চলে এবং অন্যকেও গোমরাহির পথ প্রদর্শন করে। আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছি, এই ভাইরা বিষয়টি বুঝুক আর আর না বুঝুক, ইতিহাস সাক্ষী এই ধরণের দাওয়াতের দ্বারা জিহাদের খুব কমই ফায়দা হয়েছে। কারণ এখানে দাওয়াত কম আর লোকদেরকে জিহাদ থেকে বিমুখ করা হয় বেশি। এ ধরণের দাওয়াত জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকেও অনেক সময় পথভ্রষ্ট করে দেয়। এবং তাদেরকে সীমালঙ্ঘন ও তাকফিরের অন্ধকারে নিমজ্জিত করার মাধ্যম হয়।

আমি আবারও বলছি, উল্লেখিত ভাইদের ইখলাস নিয়ে কোন কথা বলছি না। কিন্তু শুধুমাত্র ইখলাস মোটেও যথেষ্ট নয়। ইখলাসের সাথে সাথে আমাদের ফিকির ও আমল সুন্নত অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। আল্লাহর কাছে যেই ইখলাস গ্রহণযোগ্য তা হলো, আমরা হক্ক জেনে তার সামনে আমাদের মাথা ঝুঁকিয়ে দিব। আত্মসমালোচনা হবে আমাদের মূলভিত্তি। আমাদের কথা ও কাজ যেন শরীয়ত অনুযায়ী হয়, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এর বিপরীতে আমরা যদি ঐসমস্ত কাজকে সঠিক বলি, যাকে আমাদের অন্তর সঠিক বলে - তাহলে তা ঐ ইখলাস নয় যা আল্লাহর নিকট নাজাতের মাধ্যম। বরং এটা হবে নফসের চাহিদা পূরণ - যা সমস্ত খারাবির মূল। নফসের অনুসরণ মানুষকে গোমরাহী ও অপবিত্রতার এমন গভীরে পৌঁছে দেয়, যার পরিণতি দুনিয়াতে পশুত্ব এবং আখেরাতে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন। আল্লাহ আমাদেরকে নফসের চাহিদা অনুযায়ী চলা থেকে হেফাযত করুন। দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে শরীয়তের অনুগামী করে রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সুতরাং জিহাদের পথে আহবানকারী দা'য়ীগণের জন্য জরুরী হল, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দাওয়াতের পদ্ধতি বুঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহর মনোনীত পদ্ধতিতেই জিহাদের খেদমত হতে হবে। অতএব দাওয়াতের ঐ পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকতে হবে যা দাওয়াতের কোন পদ্ধতিই নয়, এবং যার দ্বারা জিহাদের খেদমতের চাইতে ক্ষতিই বেশি হয় ।

দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা যেখানেই দাওয়াতের আদেশ করেছেন

ادع الی سبیل ربك

অর্থাৎ দ্বীন ও দ্বীনের কাজের প্রতি দাওয়াতের কথা বলেছেন, সেখানে তার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। এ পদ্ধতি হলো হেকমত, উত্তম ওয়াজ নসিহত এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে মুনাযারা করা।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থ: "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" [সুরা নাহল ১৬:১২৫]

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: এই আয়াতে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, কীভাবে আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন

১. হেকমত
২. মাওয়ায়েযে হাসানা
৩. জিদালে হাসানা।

প্রত্যেকটির বিবরণ নিম্মে উল্লেখ করা হল

১. হেকমত:
হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - খুব মজবুত বিষয়ও অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে, প্রজ্ঞার সাথে উপস্থাপন করা। যা শুনে বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ও ইলম পিপাসু আলেমগণ মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। জাগতিক দর্শন তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। হেকমত দ্বারা ওহী থেকে প্রাপ্ত কোন বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করা বুঝায়, যেন জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে কোন ধরনের খুঁত কেউ ধরতে না পারে।

২. মাওয়ায়েযে হাসানা:
অন্তর নরমকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী নসিহতকে মাওয়ায়েযে হাসানা বলে। এর মধ্যে ভাষামাধুর্য থাকবে, সেই সাথে অন্তরবিগলিত করার মতো প্রাণও থাকতে হবে। ইখলাস, সহমর্মিতা, দয়া ও উত্তম আখলাকের সাথে সুন্দরভাবে কৃত নসিহত দ্বারা পাথরের মত শক্ত অন্তরও মোমের মত গলে যায়। মৃতও প্রাণ ফিরে পায়, নিরাশাগ্রস্ত জাতি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাড়ায়। উৎসাহ ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক ওয়াজ শুনে জান্নাতের দিকে অস্থির চিত্তে দৌড়ানো শুরু করে। বিশেষ করে যাদের অন্তর হক্কের জযবায় ভরপুর, কিন্তু উঁচু চিন্তা-চেতনা ও বেশি মেধার অধিকারী নয়, তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী ওয়াজ নসিহত দ্বারা আমলের জন্য এমন এক আগ্রহ তৈরি করা যায় যা উঁচু স্তরের গবেষণালব্ধ ইলমী তাহকিকের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

তবে, দুনিয়াতে একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা সবসময় সব বিষয়ে নাক গলায়। এরা প্রত্যেক কথায় প্যাঁচ ধরে আর অযথা তর্ক করে। এসমস্ত লোকেরা হেকমতপূর্ণ কথা শোনে না, ওয়াজ নসিহতও কবুল করে না। তারা চায় সব বিষয়েই তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকুক।

৩. জিদালে হাসানা:

অনেক সময় বুঝমান, সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিকেও সন্দেহ ঘিরে ধরে। আলোচনা ছাড়া তারও এতমিনান হয়না। তাদের জন্য হল জিদালে হাসানা। যা আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থাৎ যদি এমন পরিস্থিতি হয় তাহলে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ভদ্রতা, সঠিক দিকনির্দেশনা ও ইনসাফের সাথে মুনাযারা করবে। প্রতিপক্ষকে কোন অভিযোগ দিলে উত্তম পদ্ধতিতে দিবে। অযথা অন্তরে আঘাতকারী কথাবার্তা বলে ঝগড়ার পরিবেশ তৈরি করবে না। বিষয়টি এমনভাবে পেশ করতে হবে যেন অনেক দূর পর্যন্ত না গড়ায়। লোকদেরকে বুঝানো ও সত্য প্রতিষ্ঠা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। কঠোরতা, খারাপ ব্যবহার, চাপাবাজি ও গোয়ার্তুমি দ্বারা কোন ফায়দা হয় না।

মুফতি শফি রহ. দাওয়াতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে আম্বিয়ায়ে কেরামের তরীকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহর পথে আহবান মূলত নবীগণের কাজ। উলামায়ে কেরাম এ দায়িত্ব পালন করেন নবীদের নায়েব বা প্রতিনিধি হিসেবে। এজন্য জরুরী হলো দাওয়াতের পদ্ধতি ও আদবও নবীদের থেকে শিখে নেওয়া। যে দাওয়াত তাদের তরীকার উপর থাকবে না, তা দাওয়াতই না, বরং তা লড়াই বা ঝগড়ার কারণ হয়ে দাড়াবে। নববী দাওয়াতের মূলনীতি কেমন সেটা আমরা মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামকে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে শিখে নিতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

অর্থাৎ ফেরাউনের সাথে নরম কথা বল, হয়ত সে বুঝবে অথবা ভীত হবে। সুরা ত্বা-হা ২০:৪৪

প্রত্যেক দাঈর সর্বদা এ বিষয়টি মাথায় রাখা উচিৎ যে, ফেরাউনের মত অহংকারী কাফের, যার মৃত্যুও আল্লাহর ইলম অনুযায়ী কুফর অবস্থায়ই হবে - তার ক্ষেত্রেও আল্লাহ নিজের দাঈকে নরম ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে বলেছেন "নরমভাবে দাওয়াত দিবে"।
বর্তমানে আমরা যাদেরকে দাওয়াত দিই, তারা কেউ ফেরাউনের চেয়ে বড় গোমরাহ নয়। আর আমদের কেউ মূসা ও হারুন আলাইহিস সালামের মত পথপ্রদর্শকও নই। তো যেই অধিকার আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুই নবীকে দেননি যে, "মাদউর সাথে শক্ত ব্যবহার করবে, তাকে অপমান করবে" - সে অধিকার আমাদের কোথা থেকে অর্জন হয়ে গেলো?!!!

কুরআনে কারীমে নবীগণের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং কাফেরদের সাথে মুনাযারার আলোচনা অনেক আছে। কোথাও দেখা যায় না যে, ইসলামের বিরোধিতাকারীদের জবাবে কোন নবী কখনও কোন শক্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এবিষয়েও খেয়াল রাখতেন যে, মাদউর অপমানও যেন না হয়। তাই কাউকে যদি তিনি কোন ভুল বা অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখতেন, তখন তাকে কিছু না বলে সাধারণ মজলিসে বলতেন "লোকদের কি হলো যে, তারা এমন এমন করে?"। এই সাধারণ সম্বোধনে যাকে শোনানোর উদ্দেশ্য সেও শুনতো এবং নিজের সংশোধনের ফিকিরে লেগে যেত।

সাধারণত নবীগণের অভ্যাস ছিলো শ্রোতাকে লজ্জা থকে বাঁচানো। তাই অনেক সময় যে কাজ শ্রোতার দ্বারা সংঘটিত হতো তা নিজের দিকে নিসবত করে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। সূরা ইয়াসীনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর এবাদত করব না? সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২২

এটা তো জানা কথা যে, আয়াতে উল্লেখিত এই দূত সর্বদা আল্লাহর ইবাদতেই লিপ্ত থাকতো, শুধু কাফের শ্রোতাকে শুনানোর উদ্দেশ্যই এই কাজকে নিজেদের দিকে নিসবত করে বলেছেন।
দাওয়াতের উদ্দেশ্য শুধু অন্যের সমালোচনা করা নয়, বরং অন্যকে নিজের কাছে ডেকে আনা। আর এই ডাকা তখন কার্যকর হবে যখন বক্তা-শ্রোতা উভয়ের মাঝে কোন একটি বিষয়ে একাত্মতা থাকবে। এজন্য পবিত্র কুরআনে নবীগণের দাওয়াতের অধিকাংশই يا قوم 'ইয়া কওম' (হে আমার সম্প্রদায়!) শিরোনামে এসেছে। নবীগণ "হে আমার সম্প্রদায়" এই শব্দের দ্বারা প্রথমেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদের সংশোধনের আলোচনা করেছেন যে, "আমরা তো ভ্রাতৃত্বের দিক থেকে একই জাতের মানুষ, আমাদের মাঝে তো কোন দূরত্ব নেই"। একথা বলেই তাদের সংশোধনের কাজ শুরু করতেন। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বাদশার নামে যে চিঠি পাঠিয়েছেন, তাতে তাকে 'আযীমুর রোম' তথা রোমের সম্মানিত বাদশা উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। এখানে তাকে "রোমের সম্মানিত বাদশা" বলে সম্মান করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সীরাহ নিয়ে যদি ফিকির করা হয়, তাহলে তালীম ও দাওয়াতের এধরণের অনেক আদাব ও উসুল পাওয়া যায়। বর্তমানে তো দাওয়াত ও ইসলাহ এবং আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের কোন খেয়ালই নেই। আর যারা দাওয়াতের কাজে লিপ্ত আছে, তারা শুধু বহাছ-মুনাযারা, তর্ক-বিতর্ক, প্রতিপক্ষকে অভিযোগ করা, কথায় আটকানো এবং তাকে অপমান করাকেই দাওয়াত বানিয়ে নিয়েছে। যা সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে কখনই প্রভাব বিস্তারকারী ও উপকারী হয়না। তারা মনে করে আমরা ইসলামের অনেক খেদমত করে ফেলেছি। বাস্তবে তারা মানুষকে দূরে সরানোর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উক্ত আয়াতের তাফসীর থেকে জানা যায় যে, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া। আর এই দাওয়াতের মূলনীতি দুইটি - হেকমত এবং মাওয়ায়েযে হাসানা। তর্ক যদি করতে বাধ্য হয় তাহলে সেখানে 'আহসান' তথা উত্তম পন্থায় করার শর্তসহ জায়েজ বলেছেন। কিন্তু এটি দাওয়াতের কোন স্বতন্ত্র বিভাগ নয়, বরং এটি দাওয়াতের নেতিবাচক দিকেরই একটি প্রচেষ্টা; এক্ষেত্রে কুরআনে কারীমে بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ এর শর্ত লাগিয়ে একথা বলে দিয়েছেন যে, দাওয়াত কোমলতার সাথে কল্যাণকামীতা ও সহমর্মিতার আগ্রহ নিয়ে হওয়া উচিৎ। সেইসাথে শ্রোতার অবস্থা অনুযায়ী স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে হওয়া উচিৎ। শ্রোতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা থেকে পরিপূর্ণ বেঁচে থাকতে হবে।

এরপর দাওয়াত 'আহসান'(সর্বোত্তম) হওয়ার জন্য জরুরী হলো বিষয়টি বক্তার জন্য ক্ষতিকর না হওয়া। অর্থাৎ দাওয়াতের মধ্যে বদ-আখলাক তথা হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, পদমর্যাদার লোভ ইত্যাদির মিশ্রণ থাকতে পারবে না, যা বাতেনি কবিরা গুনাহ। আর বর্তমানে খুব কম মানুষই আছে যারা বহাস, মুনাযারার মধ্যে এ সমস্ত খারাবী থেকে বেঁচে থাকতে পারে। অধিকাংশই বেঁচে থাকতে পারে না। ইমাম গাজালি রহ. বলেন: "যেমনিভাবে মদ পান করা সমস্ত খারাবীর মূল - নিজের আত্মিক খারাবী এবং বহু শারীরিক খারাবীর জন্ম দেয়, তেমনিভাবে তর্ক বিতর্কের মধ্যে যদি উদ্দেশ্য থাকে অপর পক্ষের উপর বিজয়ী হওয়া, নিজের ইলমকে অন্যের সামনে প্রকাশ করা, তাহলে এটাও অন্তরের সমস্ত খারাবীর মূল। কারণ এর দ্বারা অন্তরে

অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। হিংসা, বিদ্বেষ অহঙ্কার, গিবত, অন্যের দোষ তালাশ করা, অন্যের দুঃখে খুশি হওয়া, অন্যে সুখে কষ্ট পাওয়া, সত্য গ্রহণে অহঙ্কার প্রদর্শন ইত্যাদি গোনাহের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এই জাতীয় রোগে আক্রান্ত লোকেরা অপরপক্ষের কথায় চিন্তা-ফিকির বাদ দিয়ে পাল্টা উত্তর দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয় - তাতে কুরআন হাদীসের যত তাবীলই করা লাগুক না কেন, তাই করে বসে। এটা তো এমন ধ্বংসাত্মক বিষয় যাতে মর্যাদাবান আলেমরাও লিপ্ত হয়ে পড়ে, এরপর বিষয়টি যখন তাদের অনুসারীদের পর্যন্ত পৌঁছে তখন তা ঝগড়া-
ফাসাদ ও মারামারির রুপ ধারণ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থ: নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। সুরা নাহল ১৬:১২৫

ইমাম রাজি রহ. এই আয়াতের অধীনে বলেন: এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো তোমরা শুধু এই তিন তরীকায় দাওয়াত দেয়ার জন্য আদিষ্ট। মানুষের হেদায়াত দেয়া তোমাদের কাজ নয়। আল্লাহই ভালো জানেন কে গোমরাহ, আর কে হেদায়াত গ্রহণকারী। আমার মতে নফস বা অন্তর সত্তাগতভাবে বিভিন্ন ধরণের হয়। প্রথমত কিছু নফস বা অন্তর নূরে পরিপূর্ণ ও পাক পবিত্র, যা বস্তুর দিকে কম ধাবিত হয়, আর রুহানিয়াতের দিকে বেশি ধাবিত হয়। আর কিছু অন্তর অন্ধকারে পরিপূর্ণ - যা বস্তুর প্রতি আগ্রহী বেশি, আর রুহানিয়াতের দিকে ধাবিত হয় কম। সুতরাং যার অন্তরাত্মা যেমন সে তার বিপরীতটা খুব কমই গ্রহণ করে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন - তোমরা তিন তরীকায় দাওয়াত দাও। আর সব মানুষের হেদায়াতের পিছনে পরে থেক না। আল্লাহ পথভ্রষ্টদের গোমরাহি এবং পবিত্র অন্তরের পবিত্রতা সম্পর্কে ভালো জানেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন: আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের জন্য মানুষের সাথে মুহাব্বত সৃষ্টিকারী লোকের প্রয়োজন। এমন লোক যার মন বড় ও জবান পবিত্র। কোন মুসলমানকে কোন খারাপ কাজ করতে দেখলে একথা বলবেনা যে, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করি, কারণ তুমি এই এই খারাপ কাজ কর। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করো না। বরং তাকে এভাবে বল; আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, কিন্তু তোমার অমুক কাজটা খারাপ, তা পরিত্যাগ করা উচিৎ।

শহীদে উম্মাত শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছেন: জিহাদি মিডিয়ায় এমন শব্দ, বাক্য ও কথা, বলা এবং লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে যা একজন মুসলমানের শানের খেলাফ। যে কোন মুসলমানের সাথেই ঘৃণা, গালিগালাজ, ভাষার ভুল ব্যবহার উচিৎ নয়। মিডিয়ায় লেখা বা বলার সময় শরয়ী নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। এ বিষয়টি দেখতে হবে যে, আমাদের এই কথা দ্বারা জিহাদের ফায়দা হবে? না ক্ষতি হবে? আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে, মুজাহিদদের জন্য এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা কত জরুরী। আমার খেয়াল হলো এখনই আমাদের সমস্ত মিডিয়াগুলোকে কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। কারণ এই মিডিয়াই উম্মত পর্যন্ত আমাদের আওয়াজ পৌঁছায় এবং উম্মতের সাথে আমাদের সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম। এই মিডিয়াই আমাদেরকে উম্মতের সামনে তুলে ধরে। এজন্য জরুরী হলো আমাদের মিডিয়া উম্মতের বুঝ অনুযায়ী হবে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতি জানাবে। তেমনিভাবে আরেকটি বিষয় মিডিয়ার ভাইদের জন্য জরুরী, তাদের প্রকাশনাগুলো যেন সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে হয়। উম্মাহকে অন্ধকারের গভীরতা থেকে বের করে নিয়ে আসার ফিকির তাদের মধ্যে থাকতে হবে।

মুজাহিদ আলেমে দ্বীন শায়েখ আতিয়াতুল্লাহ রহ.বলেন: মুজাহিদ নেতাদের জন্য জরুরী হলো নিজেরা এই গুণ অর্জন করবে, এবং নিজ সাথীদেরকে এমন তরবিয়ত করবে যে, তারা যেন মানুষের উপর দয়াকারী ও সহজকারী হয়। তাদের ভুল-ত্রুটি ও অন্যায় দেখে শাস্তি, হত্যা ও প্রতিশোধের হুমকি প্রদানকারী না হয়। বরং কোমলতা ও নমনীয়তার সাথে ধীরে ধীরে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন জামাত পাঠাতেন বা কাউকে কোন দলের আমীর বানাতেন তখনই নসিহত করতেন:

يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا متفق عليه

"তোমরা সহজ কর, কঠিন কোরো না। সুসংবাদ দাও, দূরে সরিয়ে দিও না"। (বুখারী মুসলিম)

আমরা কি কখনও এটা নিয়ে চিন্তা করেছি? এর উপর আমল করেছি? আল্লাহ এ সমস্ত উলামায়ে কেরাম ও জিহাদের নেতাদেরকে সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে যথাযথ প্রতিদান দান করুন। এবং আমরা যেন সুন্নত অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করতে পারি সে তাওফিক দান করুন। আমীন

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!
আমরা মুজাহিদগণ দ্বীন ও জিহাদের দা'য়ী। জিহাদও আমাদের ময়দান, একই সাথে দাওয়াতও আমাদের ময়দান। যে সমস্ত শক্তিধর ব্যক্তিরা অস্ত্র দিয়ে আমাদের উপর কুফুরী শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র নিয়ে ময়দানে আছি, এবং মুসলিম জাতিকে আমাদের সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার প্রতি আহবানও জানাচ্ছি। জিহাদের ময়দানের চাহিদা ভিন্ন, আর দাওয়াতের নিয়মনীতিও ভিন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দানে কঠোরতা করেছেন, রক্ত প্রবাহিত করেছেন, হত্যা করা ও নিহত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত সাক্ষী যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর তরীকায় কোনো কঠোরতা নেই বরং কোমলতা। কারণ হলো দাওয়াত ও জিহাদ উভয়টির মাধ্যম, পদ্ধতি ও টার্গেট ভিন্ন ভিন্ন। জিহাদের মধ্যে শক্তিকে শক্তির মাধ্যমে দমন করতে হয়। অস্ত্র বহন করা, রক্ত প্রবাহিত করা, শরীরের অঙ্গ উড়িয়ে দেয়া টার্গেট হয়। এজন্য জিহাদে অত্যন্ত কঠোরতা দরকার। জিহাদ তো এই কঠোরতারই নাম, এটা ব্যতিত জিহাদ জিহাদই থাকে না। আর এখানে কঠোরতার মধ্যেই সাওয়াব।

এটা ভিন্ন কথা যে, শরীয়ত এক্ষেত্রেও সীমারেখা ও আদাবের উল্লেখ করেছে। কিন্তু এটি কঠোরতারই ময়দান। এখানে প্রভাব বিস্তারের জন্য কঠিন শব্দ, কঠোর আচরণ জরুরী। কিন্তু এই কঠোরতা যদি দাওয়াতের ক্ষেত্রে চলে আসে, এখানেও যদি কথা ও ভাব এমন গ্রহণ করা হয় যে, যাতে শ্রোতার মন-মস্তিষ্ক উদ্বুদ্ধ না হয়ে, বরং হিংসা, শত্রুতা, প্রতিশোধের প্রতি ধাবিত হয়, তাহলে এর দ্বারা দাওয়াতের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। জিহাদি আন্দোলনের দুর্ভাগ্যই হবে যদি জিহাদের পদ্ধতি দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু হয়। একদিকে জিহাদ অন্তরের রাগ-গোস্বা দমনের জায়গা। সেখানে আক্রমণ করে জালিম অহংকারীদের মস্তিষ্ক চূর্ণ করা হয়। আর তাদের বস্তুগত শক্তি খতম করে তাদের যুদ্ধ করার শখ মিটিয়ে দেয়া হয়।

অন্যদিকে দাওয়াতের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে রাগ ও গোস্বা প্রকাশ না করে বরং দমন করা হয়। শ্রোতাকে নিচু করা অপমান করা মূল উদ্দেশ্য না। তাকে আগ্রহী করা, নিকটবর্তী করা, তার মনে জায়গা করা হল উদ্দেশ্য। দলিলভিত্তিক আলোচনা, ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা,

কোমলতা, এহসান ও দয়াই হলো দাওয়াতের ময়দানের চাহিদা। দাওয়াতের ময়দানে জরুরী হলো নিজে যথাযথ আমল করবে। কিন্তু শ্রোতাকে হক বুঝানো, হক বুঝার যোগ্য হওয়া ও গ্রহণীয় হওয়ার জন্য (শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে) যথেষ্ট চেষ্টা করবে। এই কারণে দাওয়াতের মধ্যে সুন্দর সুন্দর কথা, সুন্দর তরীকার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। শ্রোতা যদি শত্রুতা ও বিরোধিত-ার প্রকাশ করে তাহলে দাঈ শত্রুতা করবে না, বরং সে (সর্বোত্তমভাবে মুনাযারা) এর উপর আমল করবে। ঝগড়া- ফাসাদের জায়গায়ও তাকে এই আয়াত রাস্তা দেখায়। ভালো খারাপ এক হতে পারে না। আপনি শক্ত কথার জবাব এমনভাবে দিবেন যা খুব ভালো। এমন করার দ্বারা দেখবেন যে, যার সাথে শত্রুতা ছিলো সে কেমন যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। আর ধৈর্যশী-লরাই এটা অর্জন করতে পারে, ভাগ্যবানদেরই এটি অর্জিত হয়। সুতরাং প্রচণ্ড বাকবিতন্ডার মধ্যেও দাঈর দৃষ্টি দলিল থেকে সরে না। এই অবস্থায়ও সে সুন্দর কথা সুন্দর ব্যবহার করে, খারাপ আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এমনিতেই যখন খারাপ আচরণের জবাব ভালো আচরণ দ্বারা দেয়া হয়, বাড়াবাড়ির জবাব ক্ষমা, ইনসাফ ও দয়া দ্বারা দেয়া হয়, তখন শ্রোতার পাথরের মত শক্ত অন্তরও মোমের মত গলে যায়। শত্রুতার আগুন ঠান্ডা হয়ে যায়। এভাবেই দাঈর জানের দুশমনও তার রক্ষক হয়ে যায়।

দাঈর সফলতা অর্জনে তিনটি বিষয় ঠিক রাখা জরুরী।

১) ঐ দৃষ্টিভঙ্গি বা আকীদা-বিশ্বাস যার দিকে সে দাওয়াত দিচ্ছে।
২) দাঈর কথা ও কাজ তার দাওয়াত অনুযায়ী থাকা।
৩) দাওয়াতের পদ্ধতির মধ্যে সে কোন আখলাকের সাথে দাওয়াত দিচ্ছে।

এমনিতেও এই তিনটি বিষয় পরস্পর একটি আরেকটির সাথে মিল আছে। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি যা হবে, ফিকির ও আমলের তরীকায়ও তারই প্রভাব পড়বে, তারই ঘ্রাণ দাওয়াতের মধ্যেও পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছু জায়গায় এর ব্যতিক্র-মও হতে পারে। যেমন ফিকির ও প্রভাব ভালো কিন্তু দাওয়াতের মধ্যে কঠোরতা থাকে। সুতরাং দাঈর ফরজ তখনই আদায় হবে, যখন এই তিনটি বিষয় বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত হবে। এমন যদি হয় তাহলে দাঈ আল্লাহর কাছে কামিয়াব হবে, আল্লাহ যদি চান তাহলে তার দাওয়াত কার্যকর হয়ে শ্রোতাদের অন্তরে প্রবেশ করবে। এর বিপরীতে দাঈ যদি এমন তরীকা অবলম্বন করে, যা তার দাওয়াতের সাথে মিলে না - তাহলে সে নিজের ধারণায় যদিও হকের দাওয়াত দিচ্ছে, কিন্তু তরীকা সুন্নত অনুযায়ী না হওয়ার কারণে, তার শক্ত ব্যবহারের কারণে খুব কম মানুষই ফায়দা পাবে। এই ধরণের দাওয়াত মানুষের থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়। কোন দাওয়াত ব্যর্থ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, দাওয়াত প্রদানকারী নিজেই দাওয়াতের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাড়ায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

অর্থ: হে কম্বল আবৃতকারী! উঠুন এবং ভয় দেখান। এবং আপনার প্রভুর বড়ত্ব বর্ণনা করুন। আর আপনার কাপড় পবিত্র রাখুন, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন, দয়া করে বিনিময় বেশি আশা করবেন না। এবং আপনার প্রভুর জন্য ধৈর্য ধারণ করুন। (সুরা মুদ্দাসসির ৭৪:১-৭)

মুমিনের জন্য নিজের কথাবার্তার সংশোধন খুব জরুরী। কারণ কথাবার্তার সংশোধনের মাধ্যমেই অন্তর ও আমলের সংশোধন হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদেরকে খুব সুন্দর ভাষায় কথা বলার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ: আমার বান্দদেরকে বলে দেন তারা যেন মানুষের সাথে খুব সুন্দরভাবে কথা বলে। সুরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৫৩

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে কথা বলার ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ভদ্রতা বজায় রাখতে বলেছেন, কথায় যাতে জুলুম না থাকে।

আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ

অর্থ: যখন তোমরা কথা বল তখন ইনসাফের সাথে বল। সুরা আন'য়াম ৬:১৫২

তাই আমরা যখন কথা বলবো তখন ইনসাফের সাথে বলবো। এই দ্বীনের দাঈর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, সে এই ঘোষণা দেয়; কেউ এই দ্বীনের চাহিদা পূরণ করুক বা না করুক আমিই সবার পূর্বে পূরণ করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। সুরা আন'য়াম ৬:১৬২-১৬৩

সুতরাং দাঈ সর্বদা চেষ্টা করবে নিজের ফিকির ও মানহাজও যেন সুন্নত অনুযায়ী হয়। কর্ম ও দাওয়াতের পদ্ধতিও যেন সুন্নত অনুযায়ী হয়। যেই হকের দাওয়াত দিচ্ছে তার কাজের মধ্যে তার নমুনা যেন পাওয়া যায়। আর তার দাওয়াতের মধ্যেও যেন সর্বদা তার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। ফিকির ও আমলের মানহায এবং কর্ম ও দাওয়াতের পদ্ধতি যদি হক ও এক হয় তখন দাওয়াতে সফলতা আসবে ইনশা আল্লাহ।

জিহাদের দাঈ কখন নিরাপদ থাকে

জিহাদের দাঈ যেই বিপদ ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে, খুব কম মানুষই এমন বিপদের মধ্যে থাকে। মাধ্যম, অস্ত্র, সংখ্যা সবদিক থেকেই নিজের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়। অনেকসময় যাদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় নিজের সাথে রাখতে চায় তারাই বিরোধিতা শুরু করে, তখন খুব ধৈর্য ও হেকমতের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া জিহাদের সফরে পদে পদে এমনসব বিষয় উপস্থিত হয়, যেখানে সামান্য ভুলও বড় ধরণের বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়। অনেকসময় জযবা হুশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহর দয়া না থাকলে দাঈ ও মুজাহিদ সঠিক রাস্তা থেকে সরে যেতে পারে, এবং নিজেই জিহাদের দাওয়াতের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। এই ক্ষতি থেকে দাঈ তখন বাঁচতে পারে যখন তার ফিকির ও মানহাজ সুন্নত অনুযায়ী হবে। তার কাজ-কর্ম ও দাওয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনের মত হবে। আর এটা তো তখন হবে যখন সে সুন্নতের অনুসরণের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে, এবং এই ভয় করবে যে, আল্লাহ না করুন আমার কোন ত্রুটির কারণে আমার থেকে হেদায়াত ছিনিয়ে না নেয়া হয়।

এই নেয়ামতকে সিনার সাথে লাগানোর মাধ্যম হলো উলামায়ে কেরামের অনুসরণ ও নেককারদের সোহবত। দ্বীনের দা'ঈর ফিকির ও মানহাজ তখনই হেফাজতে থাকবে যখন এমন উলমায়ে কেরাম থেকে নিজের দ্বীনকে গ্রহণ করবে যাদের তাকওয়া-আখলাক, ইলম-ইনসাফ, ফিকহ-বুঝ, অভিজ্ঞতা ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন হওয়া অন্যান্য উলমায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত। তারা স্বজনপ্রীতি, প্রতিশোধ, রাগ বা নফসের চাহিদা অনুযায়ী ফতোয়া দেবে না, বরং কথা ও কাজে আল্লাহর ভয় প্রকাশ পাবে। তারা শরয়ী নীতিমালার উপর পারদর্শী হবে। আর এইসব গুণ ঐ সকল আলেমদের মাঝেই পাওয়া যাবে, যারা জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের ইজতেহাদ অনুযায়ী ফতোয়া দেয় না। বরং এক্ষেত্রে নিজের থেকে ভালো অগ্রগামী আলেমদের অনুসরণ করে এবং সমসাময়িক আলেমদের সাথে পরামর্শ করে। এমন উলামায়ে কেরাম আজও বিদ্যমান আছে। যদি জিহাদের দাঈ নিজের ফিকির, কাজ-কর্ম ও দাওয়াতের পদ্ধতিতে এই উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করে তাহলে আশা

করা যায় আল্লাহ তাকে গোমরাহ করবেন না। এবং সে দ্বীন ও জিহাদের খেদমতও করতে পারবে। এখানে একথাটিও বলে দিই - ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিগত তিন দশকের সফলতা ও জিহাদী অভিজ্ঞতা হোক, অথবা খোরাসান থেকে ইয়েমেন, মালি বা শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া বৈশ্বিক জিহাদী অভিজ্ঞতা হোক, এই সকল অভিজ্ঞতা উম্মতকে খুব দামি একটি সবক দিয়েছে। সেটি হচ্ছে হক উলামায়ে কেরামের অনুসরণেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। উম্মতের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে - এমনকি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদি বিষয় সম্ভবত একটিও এমন নেই, যে বিষয়ে জিহাদি নেতারা বিচক্ষণতার সাথে সমাধান দেননি। সুতরাং আমরা যদি এই উলাময়ে কেরাম ও জিহাদের নেতাদের দরসগুলো থেকে সবক নিতে থাকি তাহলে এই সফর খুব ভালোভাবে হেফাযত থাকবে এবং বারবার ধাক্কা খাওয়া লাগবে না ইনশাআল্লাহ।

১ম পর্ব সমাপ্ত।

চলবে...



প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে

মূল- শহীদ মুফতি মুহাম্মাদ ইশতিয়াক আ'যমী রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ- মাওলানা আশরাফ আলি

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আজ এক ভাই আমার কাছে অপর এক ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) নিঃসন্দেহে আমরাও একদিন আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব।

ভায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। মনে হচ্ছে আমরা যেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় অভিভাবককে হারালাম। তাঁর অভিভাবক সুলভ আচরণে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হতাম। আমার সন্তানেরা যখন হযরতের দরবারে যেত, তখন আমি নিশ্চিন্তে থাকতাম। আফসোস, তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। হযরতের ছায়া আমাদের মাথার উপরে দীর্ঘায়িত না হওয়ায় আমরা খুব দুঃখিত। আমরা ধারণাও করতে পারিনি, তিনি আমাদেরকে বিদায়ের যন্ত্রণা দিয়ে এত দ্রুত দুনিয়া থেকে চলে যাবেন। হযরতের কাফন-দাফনে শরিক হতে না পেরে আমি খুব আফসোস করছি। তাঁর বিদায়ে আপনাদের মতো আমিও দুঃখিত। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন হযরতের উপর রহম করেন। তাঁর ছোট-বড় সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দেন, তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দেন। তাঁর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাত দান করেন। আর তাঁর বিরহে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

সুতরাং, মানুষের জীবনের মেয়াদ এই শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত। এই চিরন্তন সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর ভাগ্যে মৃত্যুকে লিখে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ-

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। (সূরা আনকাবুত ২৯:৫৭)

আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখব, আজ কারো পিতা মারা গেছে, আগামীকাল কারো ছেলে মারা যাবে, আগামী পরশু কারো আম্মা মারা যাবে, কিছু দিন পূর্বে হয়তো কারো ভাই মারা গেছে। এরকম ভাবে একদিন আমাদের নিজেদের মৃত্যুর পালা এসে যাবে।

এই কঠিন বাস্তবতাকে নিয়ে কে ভাবে? এই বাস্তবতাকে যে বুঝতে পারে, সে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং চিন্তা করে এই দুনিয়ার সফর থেকে আমাকে একদিন ফিরে যেতে হবে। দুনিয়া তার কাছে একটা চলন্ত রেলের বগি। তাই সে দুনিয়াতে বাড়ি, মূল্যবান আসবাবপত্র তৈরির জন্য ছুটে বেড়ায় না। দুনিয়াবি কাজের জন্য মূল্যবান সময় নষ্ট করে না। দুনিয়ার নাজ-নেয়ামত যেগুলোকে আল্লাহ পরীক্ষার জিনিস হিসেবে দিয়েছেন, সেগুলোর পিছনে সময় নষ্ট করে না। কারণ তার জানা আছে, তার জন্য বরাদ্দকৃত সময় অত্যন্ত অল্প ও মূল্যবান। এটাও জানে এই সময়ের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। 'তুমি যৌবন কাল কোথায় অতিবাহিত করেছ'? 'তোমার কামাইকৃত সম্পদ কোথায় খরচ করেছ'? 'এই কিছু সময় তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, এই সময়কে কোথায় ব্যয় করেছ'? এগুলোর উত্তর না দেয়া পর্যন্ত হাশরের মাঠে ছাড়া পাবে না।

আসল কথা হল:-
আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সময় দিয়ে সুযোগ দিয়েছেন। যাতে করে ভাল আমল দ্বারা পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি নেয়। কারণ ইহকালের ভাল আমলের দ্বারা পরকালে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। আর খারাপ আমলের দ্বারা পরকালের ফলাফল খারাপ হবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন:

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ-

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।(সূরা মুলক ৬৭:২)

আমার সম্মানিত ভাইগণ!

বুদ্ধিমান হল সেই, যে চিরস্থায়ী জীবনের বাস্তবতাকে অনুধাবন করে। যদিও অনেক সময় সাধারণ মানুষ তাকে পাগল বলে মনে করে। মোটকথা জ্ঞানী লোকেরা পরকালের চিরস্থায়ী দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে সাধারণ জীবন-যাপন করে। কারণ সে জানে দুনিয়ার ভালো আমল ছাড়া পরকালে অন্য কোনো কিছু উপকারে আসবে না। সে দিন পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন সবাই একে অপর থেকে দূরে সরে যাবে। কেউ কারো কথা চিন্তা করবে না। সবাই 'নফসি' 'নফসি' করবে। এমন বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :-

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿33﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿34﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿35﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿36﴾

অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ(অর্থাৎ কিয়ামত) আসবে, (তখন পথভ্রষ্টতা-র পরিণাম বুঝতে পারবে) (৩৩) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, (৩৪) তার মাতা, তার পিতা, (৩৫) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে(অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না) (৩৬)। (সূরা আবাসাঃ ৩৩-৩৬)

সুতরাং, যখন কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি সামনে আসবে তখন লোকেরা নিজের ভাই, পিতা, মাতা, বিবি এবং নিজের ছেলে থেকেও দূরে সরে যাবে। কিয়ামতের দিন সকলের ফিকির থাকবে যে, তার আমলনামা সামনে থেকে ডান হাতে দেওয়া হবে, না কি পিছন থেকে বাম হাতে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন :-

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَه بِيَمِيْنِه-فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا-اِنَّه كَانَ فِيْ اَهْلِه مَسْرُوْرًا-اِنَّه ظَنَّ اَنْ لَنْ يَّحُوْرَ

অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে প্রদান করা হবে। তবে তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে। এবং সে তার পরিজনের নিকট সানন্দে ফিরে আসবে। আর যাকে তার আমলনামা পশ্চাৎ দিক দিয়ে প্রদান করা হবে। ফলে সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। এবং দোজখে প্রবেশ করবে। এই ব্যক্তি (দুনিয়ায়) স্বীয় পরিজনের মধ্যে সানন্দে ছিল। সে ভেবেছিল যে, তাকে (আল্লাহর সমীপে) কখনো প্রত্যাবর্তন করতে হবে না। (সূরা ইনশিকাক ৭-১৪)

এখন আমাদেরকে নিজের হিসাব নিজেই মিলাতে হবে। দেখতে হবে আমরা কতজন মৃত্যু এবং পরকালের চিরস্থায়ী জিন্দেগির কথা চিন্তা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করছি? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন -

حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسِبُوْا

তোমার হিসাব নেওয়ার পূর্বেই তুমি তোমার হিসাব করে নাও।
অর্থাৎ মৃত্যু আসার পূর্বেই নিজের হিসাব নিজে করে নাও। মৃত্যুর পরে নিজের হিসাব নিজে করতে পারবে না বরং তখন নিজের হিসাব দিতে হবে। সেসময় আমাদের আর কিছু করার থাকবে না। আল্লাহ বলেন :-

وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا، وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা আল-মুনাফিকুন ১১)

মানুষ সব সময় মৃত্যুর বিষয়ে গাফেল থাকে। পরকালকে নিয়ে চিন্তা করে না। কিছুদিন পরে দেখা যায়, তাকে একটা সাদা চাদরে করে সাধারণ ভাবে মাটির নিচে রাখা হচ্ছে। তারপরেও কেন মানুষ এই দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়? কেন এই দুনিয়া নামের যাত্রীবাহী রেলের বগিতে জিনিসপত্র গোছায়? কেন এই দুনিয়ার ধোঁকার মধ্যে সন্তানদেরকে পরীক্ষায় ফেলে? কেন এই দুনিয়ার আগুনে ফেলে তাদেরকে পরীক্ষা করায়? এ ধরণের ব্যক্তিকে নসিহত করার জন্য আল্লাহ বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম ৬৬:৬)

তাদের কথা-বার্তা থেকে মনে হয়, তারা বলতে চায় - যারা নিজের সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করে, অতঃপর সন্তানেরা এই রাস্তায় অবিচল থেকে আখেরাতের রাস্তাকে সহজ করে নেয় এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরাম ত্যাগ করে আখেরাতের চিরস্থায়ী শান্তি খুঁজে বেড়ায় - তারা বোকা।

আমার মুহতারাম ভাইগণ!
আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নেতৃত্বের যোগ্য বা হকদার বানিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের কাজ ছেড়ে কাফেরদের গোলামি করে নিজেদেরকে বরবাদ করছে। আসলে আমরা জীবন ও মৃত্যুর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারি নাই। আল্লাহর কাছে দু'আ করি - তিনি যেন চিরস্থায়ী বাস্তবতাকে অনুধাবন করে, দুনিয়া এবং আখেরাতের যথাযথ আমল করার তওফিক দান করেন (আমিন)।

আমি মনে অত্যন্ত ব্যথা নিয়ে এই চিঠি লিখলাম। আমি আশা করি এই চিঠিটা শোক-সন্তপ্ত পরিবারের কাছে পাঠানো হবে। যাতে করে আমার পক্ষ থেকে সমবেদনা এবং নসিহত জানানো হয়। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম। সবাই আন্তরিকতার সাথে মরহুমের জন্য দু'য়া করি, আল্লাহ যেন তাঁর উপর রহম করেন। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ যেন আমাদেরকে আখেরাতের পাথেও গোছানোর তাওফিক দান করেন। আমিন।

সকলের নিকট দুয়ার দরখাস্ত থাকলো। যদি আল্লাহ তাওফিক দান করেন তাহলে অচিরেই আমরা আখেরাতে একত্রিত হব ইনশাআল্লাহ।



পতনের দ্বারপ্রান্তে গণতান্ত্রিক ইসলামী আন্দোলন

১ম পর্ব

চরমোনাই
জামাত-শিবির ও
জমিয়ত-খেলাফতের

নয়টি সংশয়ের দালিলিক নিরসন

মূলঃ শাইখ আবু আব্দুর রহমান শানকিতি হাফিজাহুল্লাহ
অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সালমান রুমী

পূর্বকথা: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আপন বান্দার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এমন কিতাব যার দ্বারা জগত হয়েছে আলোকময়, সত্য হয়েছে উদ্ভাসিত। যে কিতাব দ্বারা তিনি অনুগত, প্রভু অভিমুখী বিশ্বাসী গোষ্ঠীকে পথনির্দেশ দিয়েছেন। আর যত অবিশ্বাসী, সংশয়-সন্দেহের আবর্তে পতিত গোষ্ঠীকে করেছেন পথভ্রষ্ট। রহমত ও শান্তি কামনা করছি আমাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্য, যিনি মাকবুল সুপারিশের অধিকার প্রাপ্ত। যিনি মাকামে মাহমুদ (জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদা) এবং ঢেউ তোলা হাউজে কাউসারের অধিকারী। রহমত ও শান্তি কামনা তার পরিবার-পরিজন, সম্মানিতা স্ত্রী ও সাথীবর্গের জন্য। হামদ ও সালাতের পর, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

"তোমাদের মাঝে আমি দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে থাকবে, কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। বিষয় দুটি হলো ১. আল্লাহর কিতাব ও ২. তার নবীর সুন্নাহ। (মুয়াত্তা)

অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজ মুসলিম জাতি ওহীর অকাট্য প্রমাণাদি এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলী গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। এগুলো সাধারণ আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও অনুরাগ-বৈরাগ্যের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আজ মুসলিম জাতি বৈষয়িক স্বার্থের অবান্তর আশা ও অলীক কল্পনায় বুঁদ হয়ে নিজ রবের কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে বিমুখ। কোথায় আজ আল্লাহর অটুট রজ্জু আঁকড়ে থাকার আবশ্যকতা?! কোথায় আজ সর্বশেষ রাসূলের সুন্নাহকে দাঁত কামড়ে ধরে রাখার অপরিহার্যতা?!

বস্তুত আজ তারা এমন অসংখ্য ফেতনার ভেতরে বসবাস করছে, যার কোনট-ার ভয়াবহতার মাত্রা কোনটার চেয়ে কম নয়। এমনসব ফেতনা! যেখানে বিবেকবান দিশেহারা হয়ে পড়ে, জ্ঞানী উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এ যুগে সে সকল ফেতনার মাঝে অন্যতম হলো গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, যা মূলত প্রবৃত্তি পূজা ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কেনই বা হবে না?!

এই গণতন্ত্র যে দ্বীনের মাঝে এক নব উদ্ভাবন
এই গণতন্ত্র যে কাফেরদের পথ ও পন্থার অনুসরণ
এই গণতন্ত্র যে মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছেদ সাধন
এই গণতন্ত্র যে বিশ্বপ্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রদর্শন

এই গণতন্ত্র যে নির্বোধ ও মূর্খদের বিধানদাতা রূপে গ্রহণ। এ তো এমন এক ফেতনা, যেখানে গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয়। আল্লাহর বিধান ছেড়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার-আচার করা হয়। যেখানে মানুষেরা জনপ্রতিনিধি ও নিজেদের প্রবৃত্তির সামনে মাথা নত করে। এ এমন এক জঘন্য শিরক, এ ভ্রান্তি এতোটাই সুস্পষ্ট, যার কাছে দ্বিপ্রহরের সূর্যও হার মানে। এই ফেতনার জঘন্যতা, এই আপদের ভয়াবহতার মাত্রা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন একদল 'দ্বীনের দায়ী' এই ফেতনার গুহামুখে প্রবেশ করা ছাড়া দাওয়াতের কথা চিন্তাই করতে পারছে না।

দ্বীন ইসলামের মাঝে এক অতি মহৎ ইবাদত হল এ সমস্ত ফেতনাবাজদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর সুস্পষ্ট কিতাবকে আঁকড়ে থাকতে ও নব উদ্ভাবিত যত ফিতনা, মিথ্যাচারীদের যত পথভ্রষ্টতা ছুঁড়ে ফেলতে মানুষকে উৎসাহিত করা। ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ 'মাজমুউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে বলেন:
"কোরআন-সুন্নাহবিরোধী মতবাদের প্রবক্তা অথবা কোরআন-সুন্নাহবিরোধী ইবাদতে বিশ্বাসী বিদআত-পন্থীদের উচ্চপর্যায়ের লোকদের ব্যাপারে কথা হল, তাদের বিভ্রান্তি ফাঁস করা এবং উম্মতকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করা উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। ব্যাপারটা এতটাই গুরুতর যে, আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "এক ব্যক্তি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, এতেকাফ করে, অপর এক ব্যক্তি বিদআতপন্থীদের ব্যাপারে কথা বলে, আপনার কাছে কে বেশি প্রিয়"? তখন তিনি বলেন: "ব্যক্তির নামাজ, রোজা, এতেকাফ ইত্যাদি নফল আমল তার নিজের জন্য। আর বিদআতপন্থীদের ব্যাপারে কথা বলাটা হলো মুসলমানদের স্বার্থে। অতএব এই দ্বিতীয়টিই অধিক উত্তম"।

আমরা দেখতে পেলাম, এই দ্বিতীয় আমলটি মুসলমানদের দ্বীন-ইসলামের কল্যাণে অবদান রাখে, কাজেই তা একভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত পথ, তাঁর দ্বীন, সে দ্বীনের রূপরেখা, তার চৌহদ্দি ও সীমারেখা এবং ধর্মীয় বিষয়ে এ সকল ভ্রান্ত লোকদের সীমালংঘন ও দুরাচার রোধ করা মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে ফরজে কেফায়া। (যা পালন করা যথেষ্ট সংখ্যক লোকদের উপর আবশ্যক)। এ সকল লোকদের অনিষ্ট প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ তাআলা যদি লোক তৈরি না করেন, তবে যে এই দ্বীন-ইসলাম বিকৃত হয়ে যাবে! আর এই অরাজকতা নিঃসন্দেহে আহলে হরবের শত্রু কর্তৃক মুসলিম ভূখণ্ড দখলের অরাজকতা অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। আর ধর্মের জন্য হুমকি, এমন প্রতিটি লোকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াকে আল্লাহ তাআলা কেবল অনুমোদনই দেননি, বরং তা আবশ্যক করেছেন।

অতএব আমরা জানতে পারলাম, এমন ব্যক্তির পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং তার রহস্য ফাঁস করা আমাদের জন্য কর্তব্য, যাতে মূর্খেরা তার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। কাজী ইয়াজ "আশশিফা" গ্রন্থে সে সকল অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যে সকল অবস্থায় কুফরি বাক্য বর্ণনা করা জায়েজ হয়ে যায়। তেমনি একটি অবস্থা হল, কেউ যদি নবীজি ﷺ কে গালি দেয়। তিনি লিখেন
"অতএব যদি [আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে] গালিদাতা ব্যক্তি এমন হয়, যার থেকে ইলম শিক্ষা করা হয়, অথবা হাদিস বর্ণনা করা হয়, কিংবা প্রাপ্য অধিকারের ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত, সাক্ষ্য বা ফতোয়াকে অকাট্য মনে করা হয়, তবে তার [গালাগাল] শ্রবণকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল, সে তার কাছ থেকে যা শুনেছে, তা প্রকাশ করে দেয়া, মানুষকে তার ব্যাপারে সতর্ক করা এবং তার বিপক্ষে তার বক্তব্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া। আলেমদের ভেতর যার কাছে এ সংবাদ পৌঁছবে, তার উপর আবশ্যক ও ওয়াজিব হলো, এমন ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা, তার কুফরি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা, তার বক্তব্য বাতিল হওয়ার বিষয়টা মানুষকে খুলে বলা। একাজ করতে হবে মুসলমানদের থেকে তার অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য এবং সাইয়েদুল মুরসালিন ﷺ-এর সম্মান রক্ষার্থে।

একইভাবে সে যদি এমন কেউ হয়, যে জনসাধারণকে ওয়াজ নসিহত করে, অথবা বাচ্চাদেরকে তরবিয়ত এবং আদব-কায়দা শিক্ষাদানের কাজ করে, তবে এ জাতীয় ব্যক্তির বেলায় উপরিউক্ত নির্দেশনা মেনে চলা আরো বেশি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, আভ্যন্তরীণ অবস্থা যার এমন হবে, জনসাধারণ এবং শিশুরা নিজেদের ঈমান-আক্বীদার ক্ষেত্রে তার থেকে নিরাপদ নয়। অতএব, নবীজি ﷺ -এর সম্মান রক্ষা ও শরীয়তের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে এ কাজ করতেই হবে।"

আমি যখন গণতন্ত্রের তল্পিবাহকদেরকে দেখলাম, তারা প্রকাশ্যে গণতন্ত্রের পক্ষে গলাবাজি করছে, আমি তখন নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, এদের ভ্রান্তি নিরসন করা ও সংশয় অপনোদন করা একটি অপরিহার্য দায়িত্ব, যাতে সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। তাই আমি তাদের কতিপয় সংশয় নিরসনকল্পে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সঠিক পথের দিশা কামনা পূর্বক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানা প্রণয়ন করতে মনস্থ করলাম। আর আমি এর নাম রেখেছি -تهافت الديمقراطيين (তাহাফুতুদ দিমুক্বরাত্বিয়্যীন - গণতন্ত্রপন্থীদের ক্রমশ অধঃপতন); এই আশায় যে, আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থের দ্বারা সেইসব লোকদের কর্মপন্থাকে বাতিল ও অধোমুখী প্রমাণিত করবেন!

ভাষাবিদ ইবনে ফারেস বলেন تهافت শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: কোন কিছু ক্রমে ক্রমে পতিত হওয়া। ভাষাবিদ জাওহারী বলেন تهافت শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: কোনকিছু খণ্ডে খণ্ডে পতিত হওয়া।
লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে تهافت অর্থ হলো: প্রজাপতি যেভাবে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোন কিছু সেই কায়দায় নিম্নদেশে পতিত হওয়া। শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়।
সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য ও সঠিক পথ কামনা করছি।

আবু আব্দুর রহমান শানকিতি

১ নং সংশয় : কল্যাণ ও উপকারিতা

যারা দাবী করে, গণতন্ত্রের এই সিস্টেমে অংশগ্রহণের ভেতর ধর্মীয় স্বার্থ রয়েছে, কারণ এতে করে যথাসাধ্য কল্যাণ সাধন ও অনিষ্ট দমনের সুযোগ তৈরি হয়, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই আলোচ্য বিষয়টি কল্যাণ-অকল্যাণ আর লাভ-লোকসানের বিষয় নয়। বরং এখানে ইসলাম ও কুফর এবং তাওহীদ ও শিরকের প্রশ্ন। অতএব যে ব্যক্তি অপরিহার্যভাবে আল্লাহ তা'আলা বিধানদাতা হওয়ার উপর ঈমান আনে, তার জন্য অন্য কোন জাগতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে তাওহীদের স্তম্ভ এই মৌলিক নীতি থেকে একচুল সরে আসার কোন সুযোগ নেই। উপরন্তু যখন কিনা সে স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে অলীক কল্পনা বৈ আর কিছুই নয়।

এই তাওহীদ বা একত্ববাদ রক্ষা, মানুষকে তা শিক্ষাদান এবং দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরার অনুশীলনের চাইতে বড় কোনো কল্যাণ নেই। আর সবচেয়ে জঘন্য ও নিকৃষ্ট অকল্যাণ হলো, কল্পনাপ্রসূত জাগতিক কিছু ফায়দা লাভের জন্য এই তাওহীদের গায়ে আঁচড় ফেলা। আমাদের তাওহীদ-ই যদি হয় ত্রুটিপূর্ণ তবে অন্য সব অর্জন আর প্রাপ্তির কি মূল্য থাকতে পারে?!
যেমনিভাবে অন্যায় কোন কিছুকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে একটি শর্ত হলো, তা তদাপেক্ষা বড় কোন অন্যায় জন্ম দিতে পারবে না, একইভাবে কল্যাণ অর্জনেরও একটি শর্ত হলো, সে কল্যাণ তদাপেক্ষা বড় কোনো অকল্যাণের পথ উন্মুক্ত করবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) মাজমুউল ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেন

"ভালো কাজ/বিষয় ছেড়ে দিতে হয় দুই স্থানে:

১. যখন তা করতে গেলে তার চাইতে বড় কোন কল্যাণের দিক হাতছাড়া হয়ে যায়।
২. যখন সে ভালো কাজটি করার দ্বারা এমন কোন খারাপ কাজ/বিষয়ের সৃষ্টি হয়, যার অকল্যাণ উক্ত ভালো কাজের কল্যাণ অপেক্ষা অধিক।" (খ:২০,পৃ:৫৩)

শায়খ মুহাম্মদ কুতুব গণতন্ত্রহেতু সৃষ্ট কিছু অকল্যাণের দিকে ইঙ্গিত করে লিখেন
"আমরা যখন গণতন্ত্রের চোরাবালিতে পা দেব, তখন লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-তত্ত্বে আমরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো। সর্বপ্রথম আমরা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব যে, কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানের অধিকারকে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে পরিণত করবো। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

যখন আল্লাহ এবং তার রাসুল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তখন কোনো মুমিন নারী পুরুষের জন্য সে বিষয়ে এখতিয়ারের কোনো সুযোগ নেই। (সূরা আহযাব: ৩৬)

নিশ্চয়ই শরিক বিহীন এক আল্লাহর ইবাদত; যা মূলত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মকথা, তার দাবি হলো, যেমনিভাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি একক উপাস্য হবেন, একইভাবে ইবাদত বা উপাসনার সকল নিদর্শনাবলী নিবেদন করার ক্ষেত্রে তিনি একক ইলাহ বা উপাস্য হবেন। তিনি একমাত্র বিধানদাতা হবেন। তিনি একমাত্র সঠিক পথের সীমানা-রূপরেখা তৈরি করবেন এবং এর মানদণ্ড নির্ধারণ করবেন। মানুষের জন্য তিনি একমাত্র জীবনবিধান প্রণয়নকারী হবেন। উপরিউক্ত বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক। ইসলামের স্বীকারোক্তির পাশাপাশি একজন মুসলমানের পক্ষে এ বিষয়ে কোন এখতিয়ারের কথা কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সূরা নিসা ৪:৬৫)

আমরা যখন গণতন্ত্রের চোরাবালিতে পা দেবো, তখন আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহর একক অধিকারকে এমন বিষয়ে রূপান্তরিত করে ফেলতে বাধ্য হবো, যেখানে সমস্যার সমাধান চাওয়া হয় মানুষের কাছে। সেখানে কোন বিষয় সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হওয়া বা না হওয়ার জন্য ভোটাভুটির আশ্রয় নেয়া হয়। আর তাতে যে কারো এ কথা বলার সুযোগ তৈরি হয়ে যায় যে, "তোমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর নিজস্ব মতামতকে চাপিয়ে দেয়া জায়েজ (নীতিসঙ্গত) নয়।"(!)

অতএব দাঁড়ালো, গণতান্ত্রিক এই সিস্টেম যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা ইচ্ছাস্বাধীনতার বিষয়, বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। [আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতার যেখানে কোন মূল্য নেই।] কোন একটি বিল পাসের জন্য যেখানে পক্ষের লোকদের ভোট গণনার অপেক্ষায় থাকতে হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হল, শরীয়তকে সিদ্ধান্তদাতা বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক ও অবশ্য কর্তব্য, ভোট গণনার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের এক্ষেত্রে এই অধিকার, ক্ষমতা ও এখতিয়ার নেই যে, তারা কোন বিধান চাইলে গ্রহণ করতেও পারে, আবার চাইলে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। কারণ একই সঙ্গে তারা এমন অন্যায় অধিকার চর্চা করবে আবার মুসলমান থাকবে, সেটা কখনো সম্ভব নয়।

সঠিক পন্থা হল, প্রথমে মানুষকে 'তাওহীদের ভিত্তি তাৎপর্যপূর্ণ' এ বিষয়টির প্রতি আহবান করে বোঝাতে হবে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্য পালনীয় একটি নির্দেশ। এতে বিমুখ ব্যক্তি আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যানকারী মুরতাদ। সকল মানুষ তাওহীদের এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদিষ্ট। চাই তারা শাসক হন কিংবা শাসিত। চাই এমন কোন সংগঠন বা দল থাকুক যারা এই ঐশী নির্দেশের ব্যাপারে সোচ্চার, কিংবা না থাকুক। [সর্বাবস্থায় আল্লাহর এই আদেশ পালনের অপরিহার্যতা সমান বর্তমান]। কারণ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কাছে আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার করে কোন কিছু দাবি করার পর তাঁর সেই আদেশ পালনের অপরিহার্যতা কোন মানুষের দাওয়াতের উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা যখন গণতন্ত্রের খেলায় অংশগ্রহণ করি, তখন মানুষের অনুভূতিতে ধর্মের মৌলিক এই বিষয়গুলো পুরোপুরিভাবে অনুপস্থিত থাকে। পুরোপুরিভাবে না হলেও অন্ততপক্ষে বিষয়গুলো তার মূলভাব হারিয়ে ফেলে। কারণ একটা মতাদর্শ হিসাবে এই গণতন্ত্রের মূল কথা হলো, কোন কিছু বাধ্যতামূলকভাবে কারো উপর চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকার বা ক্ষমতা কারো নেই, একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া।

গণতন্ত্রের ফাঁদে পা দিলে দ্বিতীয় যে বড় ক্ষতিটা আমাদের হয় সেটা হল, আইন প্রণয়নের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ। গণতন্ত্রে আইন প্রণয়ন হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছানুসারে। অথচ এটা আল্লাহর দেয়া মাপকাঠি নয়। আল্লাহর দেয়া মানদণ্ড ও মাপকাঠি হলো, আইন ও বিধানের একমাত্র উৎস হবে কেবলই আল্লাহর শরীয়ত। আল্লাহর শরীয়তকে একমাত্র আইনের উৎস যে ব্যক্তি না মানবে, আল্লাহর দ্বীনে তার ইসলামের কোন বৈধতা নেই। (আল্লাহর শরিয়তে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়।) যদিও সে কেবল অধিকাংশ ভোটই নয়, বরং সব ক'টা ভোট বাগিয়ে নেয় তবুও তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। এটি ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে এক চিরাচরিত ব্যবধান ও চিরন্তন পার্থক্য।

আমরা যখন গণতন্ত্রের জুয়াতে অংশগ্রহণ করব, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে আইনের উৎস হিসাবে মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই, যদিও সে সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তি আল্লাহর শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ গণতন্ত্র নামক এই জুয়ার নিয়ম এটাই। অংশগ্রহণের পর এই নিয়মের বিরোধিতা করার অধিকার আমাদের নেই। আর তখনই আমরা আগেরটার পাশাপাশি আরও একটা চেতনাগত বিভ্রান্তি ও অপরাধকর্মে লিপ্ত হই। আর তা হল, এমন বিষয়কে আইনের উৎস মনে করা, যা আল্লাহ তাআলা কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন; অর্থাৎ আল্লাহর সংবিধানবিরোধী মানব রচিত সংবিধান।
আমরা গোপনে প্রকাশ্যে একথা যতই বলি না কেন যে, আমরা মানব রচিত সংবিধানের সঙ্গে একমত নয়, কিন্তু আখের আমাদেরকে তার সামনেই মাথানত করতে হচ্ছে এবং তা অনিবার্যভাবেই। কারণ যতক্ষণ আমরা খেলায় থাকবো, ততক্ষণ খেলার নিয়ম নীতি আমাদেরকে অনুসরণ করতেই হবে। আর আমরা ইসলাম বিরোধী এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়েই ক্ষান্ত না, বরং অনেক সময় তো খেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমরা রীতিমত আবেদন করেছি। আমাদেরকে খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া না হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি।" [كيف ندعو الناس -কাইফা নাদ'উনন্নাস গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন ভাল কাজ ও কল্যাণকর বিষয় এবং তার মাত্রা ও পরিমাণের কথা চিন্তা করা, অথচ তার ক্ষতির দিক বিবেচনায় না নেয়া এমন কাজ করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেন
"কিছু কিছু শ্রেণী বিভিন্ন কল্যাণকর কাজের কথা চিন্তা করে সেটা করতে অগ্রসর হয়, যদিও তা তদাপেক্ষা বড় কোনো অকল্যাণের কারণ হয় তবুও।
(মাজমুউল ফাতাওয়া -২০/৫৮)

আহলে ইলমদের মাঝে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, ক্ষতি রোধ করা অগ্রগণ্য, যদি তা লাভের চেয়ে বড় হয়।

শাইখ ইবনে আব্দুস সালাম রহিমাহুল্লাহ বলেন

"যদি একই সঙ্গে বিভিন্ন কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বিষয় সামনে আসে, তখন করণীয় হলো যদি একইসঙ্গে কল্যাণ অর্জন করা এবং অকল্যাণ রোধ করা সম্ভব হয়, তবে উভয়টির ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে আমরা কল্যাণ অর্জন করব এবং অকল্যাণ রোধ করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا

তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো, এবং তাঁর কথা শোনো। (সূরা তাগাবুন ৬৪:১৬)

আর যদি পরিস্থিতি এমন হয়, ক্ষতি রোধ করা অসম্ভব এবং কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব, এক্ষেত্রে ক্ষতি ও অকল্যাণ যদি কল্যাণ অপেক্ষা বড় হয়, তবে আমরা ক্ষতি রোধ করব এবং কল্যাণ হাত ছাড়া হওয়াতে বিচলিত হবোনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন

يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, দুটোতেই অনেক বড় গুনাহ্ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকার রয়েছে, তবে এগুলোর গুনাহ্ এগুলোর উপকারের চাইতে বড়।

আল্লাহ তাআলা মদ এবং জুয়াকে হারাম করেছেন, কারণ এগুলোর ক্ষতি লাভের চাইতে বড়। মদের লাভ হলো 'ব্যবসা'। আর জুয়ার লাভ হল, 'জুয়াড়ি জুয়া জিতে যা লাভ করে' তা"। (قواعد الاحكام في مصالح الانام -ক্বওয়া'য়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম -১/৮৩)

শরীয়তের প্রমাণিত একটি মূলনীতি হলোড় ক্ষতি রোধ করা লাভের উপর প্রাধান্য পাবে। শাইখ ইবনুন নাজ্জার রহিমাহুল্লাহ বলেন

"অকল্যাণ রোধ ও কল্যাণ অর্জনের মধ্য থেকে যেকোনো একটি গ্রহণের পরিস্থিতি যদি সামনে আসে, তবে অকল্যাণ রোধ করাই কল্যাণ অর্জনের উপর অগ্রাধিকার পাবে"। (শারহুল কাওকাবিল মুনীর:৪/৪৪৭)

ইবনে নুজাইম রহিমাহুল্লাহ বলেন
"ক্ষতি রোধ করা উপকার অর্জন অপেক্ষা অগ্রগণ্য। কখনো যদি উভয়টার সুযোগ একসঙ্গে হাজির হয়, এমন পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতি দূর করার দিককেই প্রাধান্য দেয়া হবে। কারণ পালনীয় বিষয়ের তুলনায় বর্জনীয় বিষয়ের ব্যাপারে শরীয়ত অধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

একারণেই নবীজি ﷺ বলেন

"যখন আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ করি, তখন সাধ্যানুযায়ী তা পালন করো। আর যখন তোমাদেরকে কোন কিছুতে বারণ করি, তখন তা [পরিপূর্ণরূপে] বর্জন করো।"

কাশফ নামক গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,
"আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ অতি সামান্য কিছু বর্জন করা গোটা জিন ও ইনসানের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।" আর এই কারণেই কষ্ট দূরীকরণার্থে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া জায়েজ আছে। তবুও নিষিদ্ধ বিষয় বিশেষ করে কবিরা গুনাহের ক্ষেত্রে শিথিলতার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।এই বিষয়ে বাযযাযী রহিমাহুল্লাহ নিজ ফাতওয়া সংকলন গ্রন্থে লিখেন

যে ব্যক্তি সতর ঢাকার সুযোগ না পায়, সে এস্তেঞ্জা [পবিত্রতা অর্জন] করা ছেড়ে দেবে, যদিও সে নদীর তীরে থাকুক না কেন। কারণ নিষেধ আদেশের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এভাবে যে, কোন কাজের নিষেধ হয়ে থাকে সর্বসময়ের জন্য। [কিন্তু আদেশের ব্যাপারটা তা না]। আদেশ পুনরাবৃত্তি দাবি করে না। [অর্থাৎ কোন এক সময়ে কোনো আদেশ পালন করে ফেললে পরবর্তীতে সে আদেশের কার্যকারিতা থাকে না]
কোন মহিলার ওপর যদি গোসল ফরজ হয়, আর পুরুষদের কাছ থেকে সে সতর হেফাজতের সুযোগ না পায়, তবে সে গোসল বিলম্ব করবে।"
(الأشباه والنظائر لابن نجيم আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের১/৯০)

প্রাধান্যদানের মূলনীতিতে এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় এই যে, নিষিদ্ধতা অনুমতি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। এই মূলনীতি অন্য একটি মূলনীতিকে নির্দেশ করছে। তা হল ক্ষতি দূর করা উপকার অর্জনের চেয়ে অগ্রগণ্য।আল্লামা জাকারিয়া আনসারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন

"কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা অন্য কোন বিষয়ে নির্দেশ অপেক্ষা অগ্রগণ্য। কারণ নিষেধাজ্ঞা হয়ে থাকে ক্ষতি দূর করার জন্য। আর নির্দেশ হয়ে থাকে উপকার অর্জনের জন্য। আর ক্ষতি দূর করার আবশ্যিকতা তুলনামূলক বেশি।"
(গাইয়াতুল উসূল ফি শারহি লুব্বিল উসূল -১/১৬১)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলোর দ্বারা প্রতিভাত হয়ে গেল যে, ক্ষতি দূর করার উপর উপকার অর্জনকে প্রাধান্য দেয়ার নিষিদ্ধতা কতটা? অথচ এই নিষিদ্ধ পথেই হাঁটছে যারা অল্প কিছু উপকার ও স্বার্থ আদায়ের বিনিময়ে গণতন্ত্র হেতু সৃষ্ট অসংখ্য ক্ষতিকর দিক মেনে নিতে চাইছে।আমাদের জানা থাকতে হবে যে, ওলামায়ে কেরাম সবচেয়ে জঘন্য ক্ষতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন শিরককে। এতে করে তারা বোঝাতে চেয়েছেন, শিরক মিশ্রিত সমস্ত বড় বড় উপকার মূল্যহীন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ বিষয়ে স্পষ্ট বলেন

"নিশ্চয়ই শিরক, আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কিছু বলা, গোপন প্রকাশ্যের সকল অশ্লীলতা এবং জুলুমর্ডনিষিদ্ধ এই বিষয়গুলোর মাঝে কোন ধরনের কল্যাণ নেই।" (মাজমুউল ফাতাওয়া -১৫/৪৭৬)

তিনি আরো বলেন

"নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর মাঝে কিছু এমন রয়েছে, যেগুলো অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শরীয়ত যেগুলোর কোনটির অনুমতি দেয়নি। নিষিদ্ধ সেসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ১. শিরক। ২. অশ্লীলতা। ৩. না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কিছু বলা। ৪. জুলুম-অত্যাচার। উপরিউক্ত চারটি অপরাধ আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীতে বিধৃত হয়েছে

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (সূরা আরাফ ৭:৩৩)

অতএব বোঝা গেল, এ বিষয়গুলো সকল শরীয়তেই হারাম ছিল। এগুলোর নিষিদ্ধতার পয়গাম দিয়েই আল্লাহ তা'আলা সকল রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। কোন অবস্থাতেই এগুলোর কোনটার অনুমোদন দেননি। আর এই কারণেই উক্ত আয়াত মক্কী সূরার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৪/৪৭৭)

উপরে যা বলা হলো, তার ব্যতিক্রম কেবল বাধ্যবাধকতা বা অপারগতার অবস্থা। অপারগতা সংক্রান্ত সংশয় নিরসনের সময় আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

আমাদের এ বিষয়টিও জেনে রাখা উচিত, স্বার্থ/কল্যাণ ইত্যাদি কোনটিই এমন স্বতন্ত্র দলিল নয়, যা শরীয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণাদির সঙ্গে তুল্য হতে পারে। বরং নস [শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ /মূলপাঠ] বিরোধী যে কোন কল্যাণ বা স্বার্থ মূল্যহীন। এ বিষয়টি 'মাহসূল' গ্রন্থকার এভাবে বর্ণনা করেছেন

"শরীয়ত যে বিষয়কে বাতিল সাব্যস্থ করেছে, তার একটি উদাহরণ হল একবার কোন এক আলেম কোন এক বাদশাহর কাছে গেলেন। ওই বাদশাহ রমজান মাসে দিনের বেলা সহবাস করেছেন। তখন আলেম তাকে বললেনঃ "আপনার ওপর লাগাতার দুই মাস রোজা রাখা ওয়াজিব।" তখন বাদশা তার এই বক্তব্য অপছন্দ করলেন। কারণ তিনি [কাফফারা হিসেবে] গোলাম আজাদের কথা বলেননি। [আলেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে] তিনি বললেন "যদি আমি তাকে গোলাম আজাদ করার কথা বলতাম, তাহলে এটা তার জন্য সহজ হতো। ফলে নিজ প্রবৃত্তির ইচ্ছা পূরণে গোলাম আযাদ করাকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন।"

লক্ষ করুন, এখানে উক্ত আলেমের বক্তব্য বাতিল। কারণ তিনি এমন এক কল্যাণের কথা চিন্তা করে আল্লাহর ফয়সালার বিপরীত ফয়সালা করেছেন, যা মানব বিবেচনাপ্রসূত।"

একইভাবে আমাদের জেনে রাখা উচিত, যে কল্যাণের পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না, তিন শর্ত সাপেক্ষে তা আমলযোগ্য।

১. তা নিশ্চিত (ঘটিতব্য) হতে হবে।
২. তা সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গ হতে হবে।
৩. তা কোন নস তথা শরীয়তের স্পষ্ট কোনো নির্দেশনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবেনা।

অতএব কিঞ্চিত ধারণাপ্রসূত কোন বিষয় আমলযোগ্য না ।
কবি এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেন

واشتَرَطوا ثلاثةً شروطاً ... بغالبِ الأَنام أَنْ تُحيطَا
كذاكَ أَنْ تكونَ واقعَّيةْ ... ولم تعارَضْ حجةً شَرْعِيَّةْ

অর্থ: জ্ঞানীরা তিনটি শর্ত করেছেন
সৃষ্টি জগতের অধিকাংশকে পরিবেষ্টনকারী হওয়া।
একইভাবে তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকা
আর শরীয়তের কোন দলিল তার বিরোধী না হওয়া।

তিন শর্তের এই বক্তব্য সম্ভাব্য কোন কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে করণীয় কি, এই জিজ্ঞাসার সবচেয়ে বিশুদ্ধ জবাব। সাবাকী (রহ.) এজাতীয় কল্যাণ ও স্বার্থ লাভের বিষয়ে আহলে ইলমের মতামতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন

"*একটি বক্তব্য হলো*, কোন অবস্থাতেই এ জাতীয় কোন কল্যাণের কথা চিন্তা করা যাবে না। আর এ মতেরই প্রবক্তা অধিকাংশ আলেম।

দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, বিনা শর্তে এজাতীয় কল্যাণ রক্ষা করা অনুমোদিত। আর এ মতটি মালেক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত।

তৃতীয় বক্তব্য হলো, যা লেখক পছন্দ করেছেন যদি সে কল্যাণটি অকাট্যভাবে আবশ্যকীয় হয়, এবং তা সামগ্রিক বিবেচনায় লাভজনক হয়, তবে তা রক্ষা করা যাবে। আর যদি উক্ত শর্ত তিনটির কোন একটি না পাওয়া যায়, তবে তা রক্ষা করা হবে না।" (আল ইবহাজ: ৩/১৭৮)

আর গণতন্ত্রের তল্পিবাহকেরা যেসকল স্বার্থের কথা আওড়াতে থাকে, সবগুলোই অবান্তর আশা ও অলীক কল্পনা প্রসূত। তাতে বস্তুনিষ্ঠ নিশ্চয়তার কোন চিহ্ন নেই। কারণ সে সমস্ত কল্যাণ ও স্বার্থ নির্ভর করে ভোটদাতার সিদ্ধান্তের উপর। আর এটা তো জানার কোন সুযোগই নেই যে, আল্লাহ তাআলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন নাকি পথনির্দেশ করবেন? [সে জয়লাভ করবে নাকি পরাজিত হবে]

কিন্তু উপরিউক্ত তিন শর্তের মাসআলা দিয়ে গণতন্ত্রকে বিচার করা যায় না। কারণ গণতন্ত্র সে জাতীয় কোন কল্যাণের আওতাভুক্তই নয়। কারণ, "মাসালেহে মুরসালা" বা অজ্ঞাত ও সম্ভাব্য স্বার্থ সেগুলোই, যেগুলোতে শরীয়ত অনুমোদন কিংবা নিষেধাজ্ঞা কোনোটি দেয়নি। কিন্তু গণতন্ত্রের ব্যাপারে তো শরীয়তের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে যারা সামাজিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে, তাদের অবস্থা মূলতঃ ঐ সমস্ত ফিলিস্তিনিদের মত, যারা জুলুম হালকা করার অজুহাতে ইসরাইলী উপাসনালয়ে প্রবেশ করেছে। তাদের এই প্রবেশ তাদের উপর হওয়া জুলুমের চাইতেও অধিক জঘন্য ও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এ সমস্ত উপাসনালয়ে প্রবেশের দ্বারা তারা ইহুদীদের নিয়ম কানুনের প্রতি মাথানত করতে বাধ্য হয়। এতে সে সমস্ত ফিলিস্তিনিরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন এবং তাদের রাষ্ট্র, কুফরি সংবিধান ও ফিলিস্তিনের ভূমি জবর দখলের ব্যাপারে সম্মতি ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়। আর এটিই তো কুফর। আর এসব কিছুই তারা করতে পেরেছে জাগতিক কিছু অত্যাচার দূর করার জন্য। এরপরও তারা নিজেদেরকে ইসলামী আন্দোলনের লোক বলে দাবি করে। একইভাবে যারা যথাসাধ্য সংশোধনের দোহাই দিয়ে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছে, তারা প্রকারান্তরে শিরিকি সংবিধান মেনে নিয়েছে।

তারা মানব রচিত সংবিধানের অধীনে বিচার চাচ্ছে। প্রকারান্তরে তারা পার্লামেন্ট এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির সিদ্ধান্তকে উপাস্য হিসেবে মেনে নিচ্ছে। তারা নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে সম্মত হয়ে গিয়েছে। ধর্ম নয়, বরং ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে তারা শত্রু মিত্র নির্ণয় করছে। এসবের চেয়ে বড় অকল্যাণ কি আর কিছু হতে পারে?!

পাঠক! উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন, যে সমস্ত লোক উন্নতি ও সংশোধনের কথা বলে, তাদের উদ্দেশ্য জাগতিক উন্নতি ও সংশোধন, যদিও তা দ্বীনকে ধ্বংস করেই হোক না কেন।

আমরা আমাদের দ্বীনকে ধ্বংস করে দুনিয়া সাজাতে চেয়েছি ≈ ফলে না আমাদের দ্বীন রক্ষা হয়েছে, আর না দুনিয়া অর্জন হয়েছে।

ভালো নিয়ত বা সদুদ্দেশ্য অন্যায় কাজকে বৈধতা দিতে পারে না। এ কারণেই ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু সম্মিলিতভাবে জিকিরের আমলকারীদের ব্যাপারে বলেন "নিশ্চয়ই তোমরা ভ্রষ্টতার দ্বার উন্মুক্ত করেছ"। বর্ণনাটি হলো উমর ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে তার পিতা থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন

"আমরা একদিন ফজরের নামাজের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর দরজার কাছে বসে ছিলাম। যখন তিনি বের হবেন, তখন আমরা তার সঙ্গে মসজিদে গমন করব। এমন সময় আবু মূসা আশআরী আমাদের কাছে এসে বললেন: আবু আব্দুর রহমান কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম: না। তখন তিনিও আমাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। এক সময় আবু আব্দুর রহমান বের হলেন। বের হলে আমরা সকলেই তার কাছে গেলাম। তখন আবু মূসা তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! এইমাত্র মসজিদে আমি এমন একটা ঘটনা দেখেছি, যা আমি পছন্দ করতে পারিনি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! সেখানে খারাপ কিছুই দেখিনি। তিনি বললেন: কি সেই ঘটনা?
তখন আবু মূসা বললেন: রাতে থাকলে আপনিও দেখতে পেতেন। মসজিদে আমি একদল লোককে দেখলাম, বিভিন্ন মজলিসে ভাগ হয়ে গোলাকার হয়ে বসে তারা নামাজের অপেক্ষা করছে। প্রতিটি মজলিসে একজন [বিশেষ] লোক রয়েছে, আর সকলের হাতে পাথর রয়েছে। [বিশেষ] ওই লোকটি বলছে,"একশ বার আল্লাহু আকবার বল"। তখন তারা একশ বার আল্লাহু আকবার পড়ছে। অতঃপর সেই লোকটি বলছে:"একশো বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো"। তখন সবাই একশো বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছে।

অতঃপর সেই লোকটি বলছে,"একশো বার সুবহানাল্লাহ পড়ো" তখন সকলেই একশো বার সুবহানাল্লাহ পড়ছে।
আব্দুর রহমান বললেন: আপনি তাদেরকে কি বলেছেন?
তখন তিনি বললেন: "আমি আপনার রায় অথবা [বলেছেন] আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় তাদেরকে কিছুই বলিনি।"
তখন তিনি বললেন, "আপনি কেন তাদেরকে তাদের মন্দ কাজ গণনা করতে বললেন না? [তাদের মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ক হতে বললেন না] এবং তাদের সৎকাজগুলো নষ্ট না হয়ে যায়, সে দায়িত্ব নিলেন না?"
অতঃপর তিনি পথ চলতে শুরু করলেন। আমরাও তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তিনি ওই সকল মজলিসের একটির কাছে এসে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন: "তোমরা কি কাজ করছ?" তারা বলল: "হে আবূ আব্দুল্লাহ্! আমরা কঙ্করের সাহায্যে আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল্লাহ-এর জিকির গুনে গুনে পাঠ করছি"। তখন তিনি বললেন: "তোমরা তোমাদের মন্দ কাজের হিসাব নাও। কারণ তোমাদের কোন নেক কাজ নষ্ট না হয়ে যাক, সে বিষয়ে আমি দায়িত্বশীল। দুর্ভোগ তোমাদের জন্য হে উম্মতে মোহাম্মদ! তোমরা এত দ্রুত ধ্বংস হতে চললে কেন!? অথচ তোমাদের নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ এখনো তোমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছেন! তোমাদের নবী ﷺ-এর পোশাক মোবারক এখন পর্যন্ত পুরানো হয়নি! তাঁর পাত্র এখন পর্যন্ত ভেঙে যায়নি! ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা কি মোহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ অপেক্ষা সঠিকতর আদর্শের উপর রয়েছো না ভ্রষ্টতার দ্বার উন্মুক্ত করে বসে আছো? তারা বলল: "হে আবূ আব্দুর রহমান! আল্লাহর শপথ! আমরা তো কেবল কল্যাণই চেয়েছি।" তখন তিনি বললেন: "এমন কত কল্যাণকামী রয়েছে, কল্যাণ যাদের পর্যন্ত পৌঁছায় না! রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একটি হাদিসে বলেছেন, একটি দল বের হবে, যারা কোরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আল্লাহর শপথ! আমার মনে হচ্ছে, তাদের অধিকাংশ তোমাদের ভেতর থেকেই হবে। অতঃপর তিনি তাদের কাছ থেকে সরে গেলেন।
[বর্ণনাকারী] আমর ইবনে সালামা বলেন: "ওই মজলিসের অধিকাংশ লোককেই আমরা নাহরাওয়ানের দিন খারেজীদের সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেখেছি।" (ইমাম দারেমী নির্ভরযোগ্য সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন)

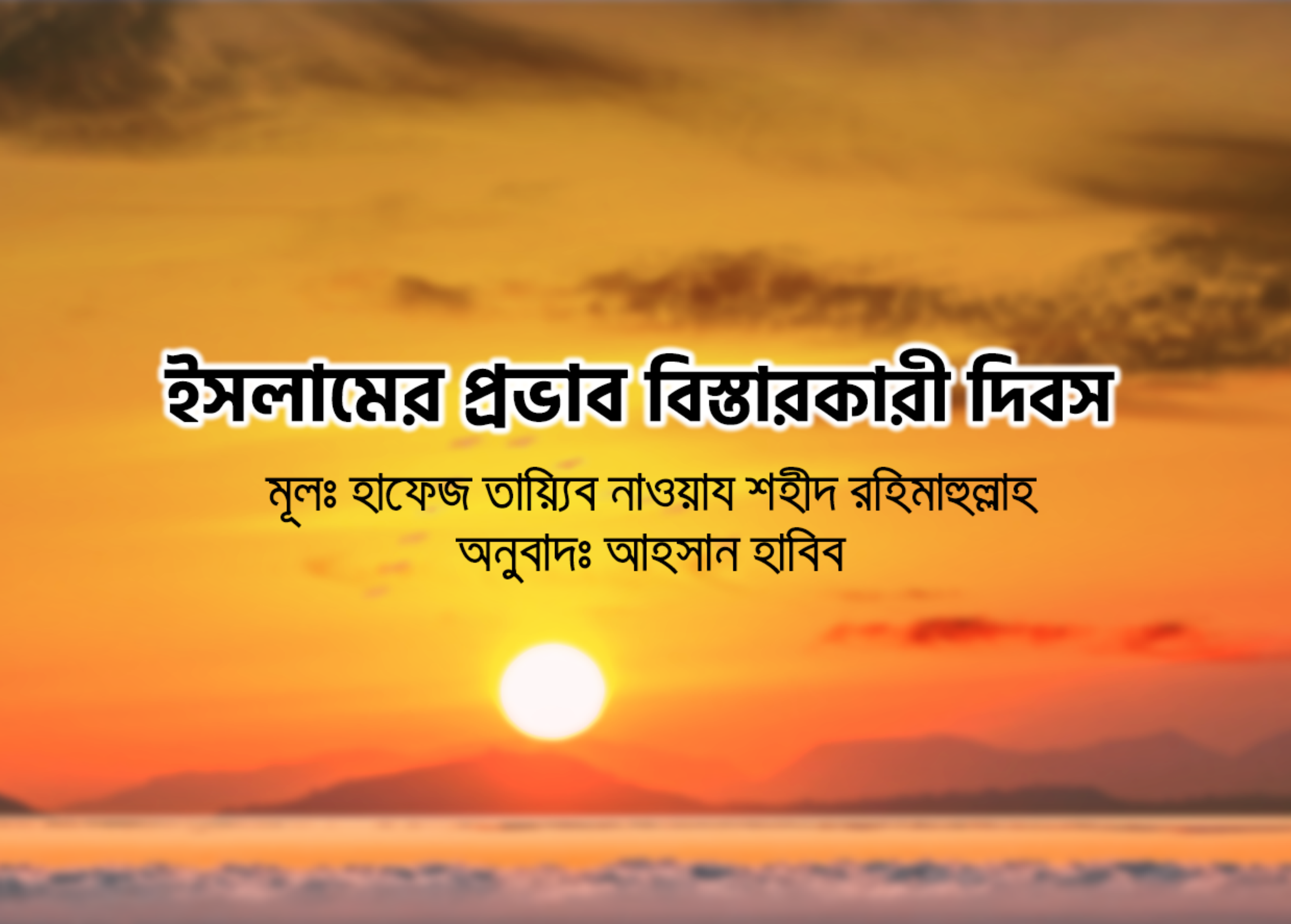
এ পর্যায়ে আমরা বলতে চাই, ওই মজলিসের লোকদের চাইতে বর্তমান গণতন্ত্রের তল্পিবাহকেরা ইবনে মাসউদের এই উক্তির অধিক যোগ্য "নিশ্চয়ই তোমরা ভ্রষ্টতার দ্বার উন্মোচনকারী।" কেবল সৎ নিয়তের কারণে গুনাহ করা বৈধ হয়ে যায় না। সেখানে কিরূপে শিরক করা বৈধ হতে পারে?!

শহীদ সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে লিখেন যে,

কতক দায়ী' কল্যাণ ও মঙ্গলের নামে এমন এক মূর্তি ও উপাস্য দাঁড় করিয়েছে, যা দিয়ে তারা শরীয়তের স্পষ্ট প্রমাণাদির সঙ্গে টক্কর দিতে চায় এবং বিভিন্ন বিধান রহিত করতে চায়!! গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এসকল লোকেরা আমাদেরকে দিশেহারা করে দিয়েছে। তারা একবার বলছে, এই গণতন্ত্র আমাদের জন্য এমন এক উত্তম প্রাপ্তি, যা পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। আরেকবার তারা বলছে, এটা অবশ্য একটি খারাপ বিষয়, তবে এছাড়া আমাদের এখন উপায় নেই। কখনো বলছে, গণতন্ত্র ইসলামকে সাহায্য করার সবচেয়ে সহজ পন্থা। তাদের এই একেকবার একেক বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, তাঁরা শরীয়তের মাপকাঠিতে এ বিষয়গুলো বিচার করেনি।

আরেক দল তো আছে, তারা দলীয় স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। যে কাজেই দলের স্বার্থ রয়েছে, সে কাজই তাদের কাছে শরীয়ত সম্মত কল্যাণ বলে গণ্য। আর সে কল্যাণের জন্য তাবৎ নিষিদ্ধ কাজ হয়ে যায় বৈধ, শরীয়তের প্রমাণাদি হয়ে যায় রহিত। আর যে কাজেই দলের কোন স্বার্থ নেই, সে কাজই তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য, যার মাঝে উম্মতের জন্য কোনো কল্যাণ নেই(!)

চলবে...



ইসলামের প্রভাব বিস্তারকারী দিবস

মূলঃ হাফেজ তায়্যিব নাওয়াব শহীদ রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদঃ আহসান হাবিব

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের বরকতময় হামলার সপ্তম বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এই হামলা আরেকবার প্রথম শতাব্দীর বিজয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এই হামলা কুফর বিশ্বের নেতা আমেরিকার সাংস্কৃতিক, সামরিক ও প্রযুক্তির দুর্বলতা পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করে দিয়েছিল।

অথচ আমেরিকা দাবি করতো - দুনিয়ার ছোট থেকে ছোট জিনিসও তার স্যাটেলাইটের আওতাভুক্ত। আর প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির কারণে নিজেকে বিশ্বের একমাত্র সুপারপাওয়ার মনে করত। এই আমেরিকাকেই মাত্র ১৯জন নেককার যুবক আল্লাহর উপর ভরসা করে সামান্য প্রস্তুতি ও সাধারণ উপকরণ নিয়ে এমন আঘাত করেছে, যা শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. এর ভাষায় 'ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে'।

১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা মার্কিনীদের প্রচন্ড ভীত করে তুলেছিল। এমন কি আমেরিকার বুদ্ধিজীবীগণ নিজেদের জাতিকে হীনমন্যতা থেকে রক্ষা করার জন্য ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বা "conspiracy theory" এর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তারা দুনিয়ার মানুষকে বুঝিয়েছে এই হামলা সি.আই.এ, অথবা কোন ইহুদী সংগঠনের কাজ।
এদিকে আরেকটি দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ইসলামী গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহ ও তাদের প্রচার মাধ্যমগুলো এই হামলাকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এমনভাবে প্রচার করেছে যে ৯/১১ এর হামলা মুজাহিদদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। বরং এটা ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র। কিন্তু তাদের এই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তি ছিল পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের মতামত ও বক্তব্য। এটা কোন মুসলমানের স্বাধীন গবেষণা নয়। বরং এই গণতান্ত্রিক মুসলমানদের পর্যালোচনা হলো - পশ্চিমাদের দেয়া তত্ত্বের নির্যাস।

আড়াইশ বছরের গোলামীর জিঞ্জীরে আবদ্ধ কথিত ইসলামী স্কলারগণের চিন্তা চেতনা এতটাই নিচু যে, দুনিয়ার যেকোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায়ই তারা ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায়। আর মুসলমানদেরকে চিন্তা, গবেষণা বা বাস্তবে কোন বড় ধরনের কাজ করার যোগ্য মনে করে না। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদরা যদিও মুখে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে, কিন্তু কার্যত সমস্ত শক্তির অধিকারী ইহুদী, জায়নিস্ট ও তাদের প্রযুক্তিকে মনে করে।

আর সেকুলার মুসলমান যারা আছে, পাশ্চাত্যের কুফরই তাদের চিন্তা চেতনার উৎস। এরা ক্রুসেডার কাফেরদের কোন ক্ষতি তো দূরে থাক, সামান্য পেরেশানিও সহ্য করতে পারে না। এরা পাশ্চাত্য থেকেই আত্মার খোরাক পায়। তাদের অবস্থা তো এমন যে, পৃথিবীর যেখানেই বসবাস করুক পাশ্চাত্যের চিন্তা চেতনাই অন্তরে লালন করে। এই শ্রেণীও ৯/১১ এর ঘটনাকে মুসলমান ছাড়া অন্য কারো দিকে সম্পৃক্ত করে। তাদের ধারণা, মুসলমান কি বিশ্বের সুপারপাওয়ার রাষ্ট্রের উপর হামলা করে বিশ্বের নিরাপত্তা নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে? এই সমস্ত 'ইন্টারনেট' বুদ্ধিজীবীরা যদি চোখ কান খোলা রেখে একটু নিরপেক্ষভাবে বাস্তবতা জানার চেষ্টা করত তাহলে অবশ্যই নাইন ইলেভেন কমিশনের রিপোর্ট দেখত। এটি ইন্টারনেটেই বিদ্যমান এবং conspiracy theory এর জবাবে লেখা হয়েছে।

এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই হামলা আল-কায়দাই করেছে। যদি হক শ্রবণ ও গ্রহণের যোগ্যতা পুরোপুরি নষ্ট না হয়ে যেত, তাহলে তারা আল-কায়দার নেতাদের এ সংক্রান্ত বয়ানগুলো শুনতো। তারা তাদের বয়ানে শুধু হামলাকারীদের প্রশংসাই করেননি, বরং শহিদদের ওসিয়ত প্রকাশ করেছেন এবং হামলার দায়ভার স্বীকার করেছেন। অন্যায় অবিচারের কারখানা আমেরিকা মানবতাবিরোধী যে সমস্ত কর্মকান্ড করেছে, তা সবিস্তারে বর্ণনা করার সুযোগ এখানে নেই। তবে, ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার কারণ বুঝার জন্য, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার অপরাধের কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরছি।

১। আমেরিকা তার জারজ সন্তান ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রকে ছয় দশক যাবত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা হাজারো মুসলিমের গণহত্যায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। হাজারো ফিলিস্তিনি মুসলমানের রক্তের দায়ভার আমেরিকার উপর।

২। মুসলমানদের কলিজা ও মুসলমানদের মারকায হিজাজ ও নজদের ভূমিতে নাপাক আমেরিকার ঘাটি নির্মাণ ও সৈন্যদের অবস্থান আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ। জাযিরাতুল আরবের আকাশপথে ও স্থলপথে আজও আমেরিকার নাপাক সৈন্যরা ঘুরে বেড়ায়।

৩। ১৯৯০ সালের পর আমেরিকা লাগাতার ১৩ বছর যাবৎ ইরাকে নজিরবিহীন জুলুম চালিয়েছে। এর ফলে ইরাকের ১৫ লক্ষ মুসলমান শহিদ হয়ে গেছে। যার মধ্যে ১০ লাখ শুধু শিশু ছিল। এরা আমেরিকার বাণিজ্যিক অবরোধের কারণে দুধ ও ঔষধের অভাবে মারা গেছে।

৪। ১৯৮২ সালে ইসরাঈল আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ লেবাননে বোমা মেরে ১৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে।

৫। ১৯৯০ এর দশকে মার্কিন সৈন্যরা হাজারো সোমালিয়ান নাগরিককে দেশ রক্ষার অপরাধে হত্যা করেছে।

৬। ১৯৯৮ সালে আমেরিকা আফগানিস্তান ও সুদানে ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করে নিজেকে বিশ্ব সন্ত্রাসী প্রমাণ করেছে।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর উম্মতের ১৯ জন বাহাদুরের কুরবানি শুধু আমেরিকার অপরাধের শাস্তিই ছিল না, বরং উম্মতে মুসলিমার বহু সুসংবাদেরও সূচনা ছিলো। এই হামলার পর শুরু হওয়া ক্রুসেড যুদ্ধ অনেক দিক থেকেই উম্মতে মুসলিমার জন্য বরকতময় প্রমাণিত হয়েছে। যেমন-

১। আমেরিকা-পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও কথিত প্রযুক্তির মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কুফর বিশ্বের দুর্বলতা এখন সবার সামনে স্পষ্ট। তারা নিজেদেরকে হামলা থেকে রক্ষা করতেও সক্ষম নয় এটা এখন প্রমাণিত। এরপর দীর্ঘ ৭ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মোল্লা ওমর দাঃবাঃ ও শায়খ উসামা বিন লাদেন দাঃবাঃ এর কোন হদিস পায়নি।

২। মুজাহিদগণ আমেরিকা ও তার সহযোগী ক্রুসেড বাহিনীকে তাদের গর্ত থেকে বের করে নিজেদের পছন্দের ময়দানে টেনে এনেছেন। যেখানে তাদের সমস্ত অহংকার মাটিতে উপবেশনকারী বীরদের হাতে ধুলোয় মিশে গেছে।

৩। আমেরিকা ও ইউরোপ মুসলমানদেরকে ভয় পেতে শুরু করেছে।

৪। ৯/১১ হামলা ও আফগান-ইরাকে যুদ্ধের ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। পুঁজিবাদও ধ্বংসের মুখে। আমেরিকা-ইউরোপে লাখো মানুষ মুসলমান হয়েছে। রেকর্ড সংখ্যক কুরআন শরীফ বিক্রি হয়েছে। ইসলামের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

৫। উম্মতের যুবকেরা জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং মুসলিম দেশগুলো জিহাদের মারকাজে পরিনত হয়েছে। এত সংখ্যক লোক এবং এত পরিমাণ জিহাদের সরঞ্জাম জিহাদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত বিগত কয়েক শতাব্দীতে পাওয়া যায়নি।

৬। দীর্ঘদিন গোলামিতে আবদ্ধ থাকার পর মুসলমানদের অন্তরে আশার আলো জেগেছে যে, আমরাও আল্লাহর সাহায্যে বড় বড় কাজ করতে সক্ষম। বিশ্ব মুসলিমরা আবারও খিলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়তের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

৭। একটি বড় ফায়দা এই হয়েছে যে, এই দিনটি 'বন্ধুত্ব ও শত্রুতা' নির্ধারণের দিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ও ক্রুসেডের মাঝে একটি স্পষ্ট বিভক্তি তৈরি হয়েছে। এই বিভক্তি মুসলিম সমাজের শাসকবর্গ ও সেনাবাহিনীর মুনাফিকী ও মুরতাদ হওয়াটা প্রকাশ করে দিয়েছে।

মোটকথা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে মুসলিম ও ক্রুসেডারদের মাঝে যেই যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, তা দ্রুত নিজ লক্ষ্যপাণে ছুটে চলেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ অবস্থান যাচাই করা উচিত - আমরা কি আল্লাহর দ্বীন ও মুজাহিদগণের সাহায্যকারী? নাকি নফসের গোলাম ও ক্রুসেডের সৈন্যদের সাহায্যকারী?

স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহর কাছে দ্বীন ইসলাম একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। আর নিরপেক্ষ থাকা কার্যত বাতিলকে সমর্থন করা। সুতরাং সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই এবং জিহাদে শরিক হয়ে উভয় জগতের সৌভাগ্য অর্জন করি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। তাগুতের বিরুদ্ধে সত্য পথের পথিক হওয়ার তাউফিক দান করুন।

এক ঈমান জাগানিয়া ওসিয়ত ও নসিহাহ

মূলঃ শহীদ রানা উমায়ের আফজাল রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদঃ আবু হুজাইফা

(শাইখ আল কায়েদা উপ-মহাদেশ শাখার সম্মানিত রোকনে শুরা। এটি তার ওসিয়ত)

গোড়ার কথা: শহীদ রানা উমায়ের আফজাল (রহ.)কে জিহাদের ভূমিতে অবস্থানরত আল্লাহর সৈনিকেরা 'হুসাইন', 'মুজ্জাম্মিল' এবং 'আমের' নামেই জানেন। এগুলোর মধ্যে 'হুসাইন' নামে দীর্ঘ সময় ও সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। ভাই হুসাইন (রহ.) জিহাদের ভূমিতে প্রায় দেড় যুগ শাহাদাতের অমিয় সুধার খোঁজ করেছেন। আল্লাহ্‌ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি জান-মাল দিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। এমনকি নিজের পরিবার-পরিজন এবং সবচেয়ে প্রিয় ও দামী বস্তু নিজের সন্তানদেরও জিহাদের ওয়াকফ করে যান। তিঁনি আল-কায়েদার মারকাজের একজন কার্যকরী রোকন এবং প্রচার সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া আল-কায়েদার আন্তর্জাতিক 'আস-সাহাব' বিভাগের প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথমে শায়েখ আতীউল্লাহ্‌ (রহ.) ফয়সালা অনুযায়ী তিঁনি আল-কায়েদা পাকিস্তানের একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হন। তারপর ২০১৩ ঈসায়ীতে আল-কায়েদার বর্রে সগীর-এ অবস্থানের পর তিঁনি এ (আল-কায়েদার প্রধান) জামাতের অংশ হিসেবে পরিগণিত হন। এরপর তিঁনি বর্রে সগীর এর মারকাযী শুরা সদস্য হন এবং একজন কূটনৈতিকের দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তাঁর সাথে যাঁদের ভালো সম্পর্ক ছিলো তারা তাঁকে 'শায়েখ মুস্তফা আব্দুল কারীম' নামে চিনতেন। তাই আমরা তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বাণীগুলোকে ব্যক্ত করতে 'শায়েখ মুস্তফা আব্দুল কারীম' নামেই আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

'শায়েখ মুস্তফা আব্দুল কারীম' এর অসিয়ত সকল বিশ্বাসীদের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। আর তার পরিবার-পরিজন ও আল্লাহর পথে লড়াকু সৈনিক মুজাহিদীনদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেকের জন্য উচিৎ হবে, এই অসিয়ত এর মান, শব্দগুচ্ছ, বয়ানের ভঙ্গিমার উপর চিন্তা ভাবনা করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই অসিয়তের রূহকে বোঝা। যে সকল আমলের আলোচনা করা হয়েছে তার উপর লাব্বাইক বলা। এ অসিয়ত একটা চিন্তা-ফিকিরের দাওয়াহ ও আমলের তালিকা। আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য শত্রুতার এক অনুপম আহ্বান। তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর বিশ্বাস আর রিসালাত ও আখেরাতের বিষয়ে একিন অর্জন করাই হলো এ অসিয়তের মূল উদ্দেশ্য।

উক্ত অসিয়তের দু'টি অংশ: প্রথমটা হলো- সাধারণ অর্থাৎ সামগ্রিক বিষয়ে অসিয়ত আর দ্বিতীয়টা হলো- অর্থ-সম্পদ বিষয়ক অসিয়ত।

অর্থ-সম্পদ বিষয়ক অসিয়ত: অর্থ-সম্পদ বিষয়ক অসিয়ত এক খাস ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শায়েখ আব্দুল কারীম মুস্তফা ছিয়াশি (৮৬) তোলা মালিক থাকাবস্থায় তার থেকে একাশি (৮১) তোলা স্বর্ণ-ই তিনি জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্‌-র জন্য ওয়াকফ করে দেন। এটা এজন্যই করেছিলেন যে, যেহেতু তিনি একজন ফিদায়ী মুজাহিদ ছিলেন, তার তামান্না অনুযায়ী নিজ উদ্যোগে স্বীয় ওয়াকফকৃত সম্পদ দিয়ে একটি ট্রাক কিনেন এবং তার জন্য বারুদ ক্রয়ের টাকাও তিনিই পরিশোধ করেন। এ বিষয়টি তার অসিয়ত থেকেই জানা যায়। এমনকি তার যদি ফিদায়ী হামলা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে জীবন চলে যায়, সেক্ষেত্রেও তার ওয়াকফকৃত সম্পদ যেন বাইতুল মালে সোপর্দ করা হয় সে ব্যাপারেও আগেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। এ ধরণের উৎসাহমূলক কাজ খুবই মূল্যবান আমল। কেননা যেখানেই আল্লাহ তা'য়ালা জান দিয়ে জিহাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানেই জিহাদ বিল-মাল এর উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে এ ধরণের আমল দ্বারা এ কথাও বুঝে আসে যে, কোনো মুজাহিদের যদি এ পরিমাণ সামর্থ্য থাকে - যা দ্বারা সে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর জিহাদের জন্য অস্ত্র, গোলা-বারুদ এবং ময়দানে যে সকল সামানা-আসবাব দরকার তা কিনতে সক্ষম, তাহলে তার উচিৎ হলো নিজের অর্থ দিয়েই এগুলো ক্রয় করা। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে কারীমের কেবল একটি জায়গা ছাড়া যেখানেই জিহাদের বিধান দিয়েছেন, সেখানেই জানের পূর্বেই মাল-সম্পদের উল্লেখ করেছেন।

শায়েখ আব্দুল কারীম মুস্তফা-এর জিন্দেগী এবং এ অসিয়তের সাথে আমাদের অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্য একদিকে আখেরাতের পথে চলা অন্যদিকে দুনিয়াকে স্বাগত জানানোর মতোই। এ পার্থক্য - মুজাহিদের আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা ও দুনিয়ার সৈনিকের মধ্যেকার পার্থক্যের মতোই। মুজাহিদ নিজের সম্পদ, জানসহ সবকিছুকে আখেরাতের জন্য আল্লাহর সমীপে নজরানা পেশ করে এবং দয়াময় পালনকর্তার সাথে বেচা-কেনা বা ব্যবসা করে যার থেকে উপকার আসতে পারে বলে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর আল্লাহর সামনে এ সকল কিছু পেশ করার উদ্দেশ্য হলো - তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জন করা। পরিচিতি আর স্ট্যাটাস উন্নতকরণের কোন লোভ এখানে নেই। এখানে মুজাহিদের সামনে না আছে কোনো সম্পদের প্রলোভন, না দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ!! বরং নিজেকে নিচু ও ছোট মনে করে শুধুমাত্র হৃদয়ের গুপ্ত আঙিনায় থাকা আল্লাহর মহব্বতের জন্যই জিহাদের পথে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। এ সকল কিছু শুধুই আল্লাহ্‌ তা'য়ালার প্রিয় দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করা এবং উম্মতে মুহাম্মাদে আরাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইজ্জত-আব্রুর সংরক্ষণ করার জন্য।

অপরদিকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য লড়াইরত সৈনিক এবং তাদের অফিসার, সিপাহীদের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে, তাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ফান্ড, প্লট, প্রসিদ্ধীলাভ আর মনের চাহিদা পূরণের জন্য। একদিকে মুজাহিদরা শাহাদাতের পরেও উম্মাহর চিন্তা, জিহাদের ফিকির এবং দ্বীনে মুহাম্মাদীর সাহায্যের চেষ্টা করে থাকে। অন্যদিকে দুনিয়াবি সৈনিক আর অফিসাররা মৃত্যুর পরেও প্লট, পেনশন এবং সন্তানাদির জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। একদিকে মুজাহিদরা নিজের অর্জিত সব সম্পদ উম্মাহর জন্য বিলিয়ে দেয়, আর অপরদিকে অফিসার বা সৈনিকরা জাতির নিকট থেকে প্রতিটি কাজের বিনিময় নিয়ে নেয়। এভাবে একদিন জাতির সম্পদের শেষ বিন্দুটুকুও লুণ্ঠন করে! (উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের জেনারেল রাহিল শরীফের ৯০ একর জমি এবং অন্যান্য লুণ্ঠনের কথা মনে রাখা উচিত)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উভয়ের মাঝে বিরাট ব্যবধান। একজনের ইলাহ্ বা মা'বুদ হলো সকল জগতের অধিপতি আল্লাহ্ তা'য়ালা, যার কুদরতী হাতেই রয়েছে বর্তমান-ভবিষ্যৎ ও আসমান-জমিনের মধ্যেকার সবকিছুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। অপরপক্ষ (অফিসার বা সৈনিকেরা) রাজত্ব, দেশ, সৈন্য-সামন্ত, দেশের সীমানা এবং রঙ-তামাশার দুনিয়াকে নিজের ইলাহ্ বা মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। উভয়ের মাঝে যেহেতু এ পার্থক্যগুলো বিদ্যমান, তাই উভয়ের প্রতিশ্রুতি বা পুরস্কারের ক্ষেত্রে কি কোনো ব্যবধান থাকবে না? এই প্রতিশ্রুতি - সেই প্রতিশ্রুতি যার থেকে কেউ পালাতে পারবে না। সকলেই সেই প্রতিশ্রুতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেখানে সব (বাতিল) ইলাহ্ বা মা'বুদ এবং সকল খোদায়ীত্বের দাবিদারেরা একে অন্যদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন কোনো একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে 'আজকের দিনে রাজত্ব কার?

সেখানকার কোনো জেনারেল, নেতা, রাজা-বাদশাহ অথবা কোনো দুনিয়া কাঁপানো ব্যক্তিত্ব কোনো কথা বলতে পারবে না। উক্ত ঘোষণার জবাব এভাবে উচ্চারিত হবে "রাজত্বতো একমাত্র ঐ আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য যিনি ক্বহ্হার বা ক্রোধান্বিত সত্ত্বা"। তখন মুজাহিদের ঐ ব্যবসা সামনে চলে আসবে যা নিজের জান-মাল, প্রিয় বস্তু আর পরিবার-পরিজনকে উৎসর্গ করে অর্জন করে নিয়েছে। অপর দিকে যারা নিজের প্রিয়জনদের দুনিয়াবি "ভবিষ্যৎ" উজ্জ্বল করার নেশায় মত্ত ছিলো তাদের কি অবস্থা হবে?

আল্লাহ্ তা'য়ালা শায়েখ আব্দুল কারীম মুস্তফা (রহ.)এর শাহাদাতকে কবুল করুন এবং তাকে আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণ, সিদ্দীকিন, শুহাদা ও সালেহীনদের সাথে হাশরের ময়দানে উঠার তাওফিক দান করুন। আমীন-ইয়া রাব্বাল আলামিন।

অসিয়ত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রেরিত বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।
অতপর: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল: আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বললো, আমরা আপনার ও আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। আর আমরাতো তারই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (সূরা বাকারা: ১৩৩)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

আর আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা ভয় করতে থাক আল্লাহকে। (সূরা নিসা: ১৩১)

স্বীয় পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং সকল ভাই ও বিশ্বাসীদের প্রতি বান্দা ফকির হুসাইন (শায়েখ আব্দুল কারীম মুস্তফা) এর অসিয়ত -

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল সংকট ও আনন্দের সময়ে নিজেকে আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া-র অলঙ্কারে সজ্জিত রাখবে। কেননা তাকওয়া হলো হিকমতের রহস্য এবং সফলতার চাবিকাঠি।
মানুষের যে বিষয়ের উপর আমল করা এবং যার সংরক্ষণ করা সবচেয়ে বেশি জরুরী ও অগ্রগণ্য, তাহলো আল্লাহ্ তা'য়ালার 'একত্ববাদ'। কারণ দুনিয়ার নিরাপত্তা ও পরকালের মুক্তির গ্যারান্টি একত্ববাদের উপর-ই নির্ভরশীল। যেমন: আল্লাহর বাণী বর্ণিত হয়েছে-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

"(বাস্তবতা হলো এই যে,) যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করেছে এবং সে ঈমানকে কোন শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে (দুনিয়াবি) নিরাপত্তার সোপান এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত"। (সূরা আনআম - ৮২)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ.

সূরা আহযাবের এ আয়াতে কারীমাকে সামনে রেখে নিজের অন্তরকে ভালো করে দেখে নাও যে, আসলেই কি রাসূলে আরাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি স্বীয় পিতা-মাতা, সন্তানসহ সকল মানুষ এমনকি নিজের জানের থেকেও বেশি ভালোবাসা আর মহব্বত আছে কি-না? আরও দেখা প্রয়োজন যে, আমি যে রাসূলের আশেক হওয়ার দাবী করি তা আমার আমলের দ্বারা বাস্তবায়ন করছি কি-না?

আখেরাতের উপর পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে। কেননা কিয়ামত দিবসের বিশ্বাস-ই মানুষকে তার আমল-আখলাক সুন্দর করতে শেখায়। তাই এ বিষয়েও খতিয়ে দেখতে হবে যে, আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি আখেরাত, না-কি ভিন্ন কিছু? আখেরাত হলে দেখতে হবে সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ধরণের।

إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

অর্থাৎ (কিয়ামত দিবসে)আমরা কেবল ধারণাই করি, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (সূরা যাসিয়া - ৩২)

যদি সত্যিকার্থে দুনিয়াকে কয়েদখানা অনুভূত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এখনো এ ব্যাপারে অনেক কষ্ট ও মুজাহাদার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। স্বীয় জবানকে হেফাজত করার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। বিশেষ করে মুজাহিদ ভাইদের জন্য আরো অধিক পরিমাণে সতর্কতা দরকার। কেননা এ জবানের গোনাহের কারণেই মানুষকে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন।

আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা!
স্বীয় আমিরের আনুগত্য করা চাই এবং ভালো কাজে যেন তার অবাধ্য না হই। কারণ- মামুরের উপর আমিরের অনেক হক্ব বা অধিকার রয়েছে। সাধারণতঃ এক্ষেত্রে অনেক কমতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর আমিরদেরও মামুরদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করা উচিৎ। নিজে যা পছন্দ করবে মামুরের জন্যও তাই পছন্দ করবে। বিশেষ করে মামুরদের মধ্যে যারা দুর্বল, যারা নিজের প্রয়োজনের কথা অনেকাংশে প্রকাশ করে না - তাদের প্রতি খাসভাবে খেয়াল রাখা চাই।

দুর্বল মুসলিমদের ব্যাপারে বিশেষ করে শুহাদাদের বিবি-বাচ্চাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করা। তাদের প্রয়োজন এবং ইয়াতিম বাচ্চাদের তরবিয়তের খেয়াল রাখা সকল ঈমানদারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিশেষ করে মুজাহিদ এবং তাদের জিম্মাদারদের জন্য এটা একটা জিম্মাদারি। তাদের কারণেই

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে রিজিক দান করেন এবং তারা সাহায্য ও নুসরত অর্জনের বিরাট ওসিলা।

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ

অর্থাৎ তোমাদেরকে দুর্বলদের কারণেই সাহায্য করা হয় এবং তোমারা রিজিক প্রাপ্ত হও। (বুখারী)

বাইতুল মালের হেফাজত করা বিশেষ করে ইয়াতিমদের সম্পদ সংরক্ষণ করা চাই। আর এ ব্যাপারে আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয় করতে হবে। একে অন্যের বিশেষতঃ আমিরদের গিবত করা থেকে বেঁচে থাকা। এবং অন্যের দোষ খুঁজে বের না করে নিজের সংশোধনের চিন্তা-ফিকির করা।

খাসভাবে মুসলিমের খুনের ইহতিরাম করা এবং কখনো কোনো সন্দেহের উপর ভিত্তি করে তার খুনকে হালাল মনে করা যাবে না। বাড়াবাড়ি এবং (অবৈধ) তাকফীর তথা কাউকে অন্যায়ভাবে কাফের না বলা। এ ধরনের ফেতনা থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং আল্লাহর নিকট হেদায়েতের উপর অটল থাকার জন্য দু'য়া করা।

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার বড় নেয়ামত। এর জন্য যতই শুকরিয়া আদায় করা হোক না কেন, তা কম-ই হবে। যদি কেউ জিহাদি জিন্দেগী গ্রহণ করে এবং এ পথে দীর্ঘ সময় পাড়ি দিতে চায়, তার জন্যে বারংবার নতুন করে ইখলাসের সাথে নিয়ত করার ব্যাপারে গাফেল না থাকা।

إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ আমলকেই গ্রহণ করেন যা শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করা হয়েছে। (নাসায়ী-৩১৪০)

মানুষের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবী রাদিয়া-ল্লাহু আনহুমদের পরে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমার পিতা-মাতা। তারপরেই যে ব্যক্তিকে আমি বেশি মহব্বত করি, সে হলো আমার সৌন্দর্য, আমার আহলিয়া এবং আমার বাচ্চাদের মা। তার কাছে আমার মিনতি হচ্ছে যে - তার যে সকল হক্ব বা অধিকার আদায়ে আমি শিথিলতা প্রদর্শন করেছি, সে যেন তা মাফ করে দেয়। আমি দু'য়া করি আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন জান্নাতেও আমাদেরকে একত্রে থাকার জন্য কবুল করে নেন।

(হে আমার প্রিয় আহলিয়া!)
আমার বাচ্চারা যেন দ্বীনের উপর চলতে পারে এমন করে গড়ে তোলা চাই। তাহলে তাদের ভাগ্যে দুনিয়ার সংকীর্ণতা কখনো আসবে না। আমার ছেলেদেরকে মুজাহিদ বানাবে এবং সহীহ আকিদা সম্পন্ন মুজাহিদদের সাথে আমার কন্যাদের শাদী করাবে। দুনিয়ার ভোগ বিলাসী বানাবে না বরং তাদেরকে আখেরাতের জন্য গড়ে তুলবে। যাতে করে তারা হযরত ফাতেমা, হযরত আসিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমাদের তারবিয়্যাহকে গ্রহণ করে নেয়।

আমার ভাইদের মধ্যে বেশি মহব্বত ও আদরের হলো আমাদের ছোট ভাই। আলহামদুলিল্লাহ! যদিও আমার সকল ভাই-ই আমাকে অনেক সাহায্য ও নুসরত করেছেন। তাদের সকলেরই অনেক অনুগ্রহ আমার উপর রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই যে মহব্বত রয়েছে, তা-কেবল আল্লাহ্-ই জানেন।

আমার ভাইদের জন্য আমার অসিয়ত এই যে, আমাদের জীবন হলো গলতে থাকা বরফের টুকরার মতো। আর মরণতো যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। তাই আমাদের জীবনের যতটুকু সময় বাকী রয়েছে তার জন্য খুব-ই জরুরী হলো যে, আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? তা ভেবে দেখা। আমরা হন্যে হয়ে যে রাস্তায় চলছি বাস্তবে এটাই কি আল্লাহ্ তা'য়ালার ভালোবাসা অর্জনের পথ? না-কি তার অসন্তুষ্টির পথ বা শয়তানের পছন্দনীয় পথ?

যে ব্যক্তির মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই, সে-তো তার ভাগ্যে ধ্বংস ও বিপর্যয়কে অনিবার্য করে নিয়েছে। সুতরাং এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিজের এবং নিজের সন্তানদের জন্য ঐ রাস্তাকেই পছন্দ করতে হবে, যে রাস্তা বা পথকে আমাদের রহীম এবং কারীম পালনকর্তা পছন্দ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। তাই আর দেরি না করে জীবনের যেখানেই আল্লাহ্ তা'য়ালার কোন অসন্তুষ্টির কাজ করেছি, তার জন্য তাওবা ও অনুশোচনা করা দরকার। ভবিষ্যতের জন্য ঐ সকল গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং আমালে সালেহ্ বা নেক কাজের জন্য স্থির সংকল্প করা দরকার।

আপনাদের সন্তানদের জন্য সবচেয়ে ভালো উপহার দিতে চেষ্টা করুন। আর তাহলো দ্বীনি ইলম ও ধর্মীয় আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া। এ বিষয়ে কোন ধরনের অবহেলা না করা এবং সুযোগকে গণিমত মনে করে কাজে লাগানো। নিজেদের সন্তানদেরকে জিহাদ ও ইলম তথা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়া। মেয়েদের বিবাহের জন্য উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদীনদের বেঁছে নেওয়া। ভালো করে জেনে নাও যে, এ বিষয়টি নিজের ও সন্তানদের জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যেকার সবকিছুর থেকে উত্তম। আপনাদের বাচ্চাদের নানা-নানী, মামা-মামী ও খালা-খালুদের জন্য আমার খাস সালাম ও ভালোবাসা রইলো।

আমার সন্তানেরা!
এ কথা সত্য যে, তোমাদের বাবা তোমাদেরকে কোনো সময় দেয়নি। আবার তোমাদের অধিকারসমূহও ঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। কিন্তু, আমার কলিজার টুকরা সন্তানেরা! এসকল কমতি হয়েছে আল্লাহর ফরজ বিধান জিহাদ আদায় করার জন্য। তোমাদের ও তোমাদের মতো লক্ষ কোটি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সন্তানদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এ বিধানটির মাঝে। এখানে সময় দিতে যেয়ে আমি তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাইনি। তোমাদের মনের চাহিদা অনুযায়ী বৈধ অধিকারগুলো আদায়েরও সুযোগ পাইনি। কিন্তু, আমার প্রিয় সন্তানেরা! ঐ পবিত্র সত্ত্বার উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে, যার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমরা কষ্ট ও মুজাহাদা করে থাকি। তিনি তোমাদের কোনো আমলই বিনষ্ট করবেন না। আর অচিরেই আমরা আমাদের ঐ জান্নাতে একত্রিত হবো, যেখানে থাকবে না কোনো ভয় আর না কোনো চিন্তা।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ

"যে সকল লোকেরা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানেরাও ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করে, তাহলে তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথী করে দিবো। আর তাদের নেক আমলের বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না।" (সূরা তূর-২১)

যাদের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে সে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন, আমিরে মুহতারাম শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে হেফাজত করুন এবং সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ তাকে দান করুন। আমীন।

ايها الشيخ الوقود و والدنا الكريم!ابشر

"হে শায়খে আযীম ও সম্মানিত পিতা! আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আপনার এমন লক্ষ লক্ষ সন্তান এবং ভক্ত রয়েছে যারা আপনার হাতের কালিমার পতাকাকে সমুন্নত করেছে। আজকে তারা নিজেদের বুকের তাজা

রক্ত দিয়ে আপনার বাণীসমূহকে সত্যায়ন করে চলছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'য়া করি, তিনি যেন আমাকেও উক্ত খোশ নসীব দান করেন এবং আপনার সাথে আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দান করেন।

হে শায়েখ! আপনার এ সন্তানকে দু'য়ার মধ্যে ভুলবেন না, কেননা আমার জন্য দু'য়া খুবই জরুরী।" এছাড়া আমার সম্মানিত উস্তাদে মুহতারাম ও মুরুব্বী শায়েখ রহমান আল-মাগরিবী দুনিয়ার মধ্যেকার প্রিয়জনদের অন্যতম। আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রভূত কল্যাণ দান করুন।

এমনই আরো প্রিয়জনেরা হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ও উস্তাদ মাওলানা উবাইদুর রহমান আল-মারাবিট, আমিরে মুহতারাম মাওলানা আসেম ওমর (হাফিজাহুল্লাহ), ভাই উসামা মাহমুদ, ভাই উসামা ইবরাহিম গৌরী, আনাস ভাই, রায়হান ভাই, দাউদ ভাই, মালিক সালমান আলী আশরাফ/হিশাম ভাই, ইসমাইল ভাই, হাসান ও হুসাইন ভাইসহ আরো অনেকের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্যই ভালোবাসা ছিলো। তাদের সাথে আমার জীবনের অনেক মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের হুযাইফা ভাই ও আদিল ভায়ের সাথে খুব মহব্বত ছিলো। এ মহব্বতকে আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় সন্তুষ্টির ওসিলা বানিয়ে দেন। মুহসিন ভায়ের সাথে যে মহব্বত ছিলো তা কারোর অজানা নয়।

আমার উস্তাদ ও মুরুব্বী শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব (হাফিজাহুল্লাহু) এর জন্য আমার খাস সালাম ও শুভেচ্ছা রইলো। হে আমাদের শায়েখ! আপনার না-লায়েক ও অধম এ ছাত্রকে আপনার দু'য়ায় ভুলবেন না! কেননা আমি এর বড়ই ভিখারী।

পরিশেষে ঐ সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, যাদের কথা এ অসিয়তন-ামায় উল্লেখিত হয়েছে, বা যাদের সাথে জীবনে কখনো কোনো সময় অতিবাহিত করেছি - সবার নিকট আমার প্রার্থনা হলো যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে ক্ষমা ও মাগফেরাতের মুহতাজ আপনি নিজেও।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা অনুগ্রহকারীদের পছন্দ করেন।" (আলে-ইমরান-১৩৪)

হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার রাস্তায় শহীদ হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমার রক্তকে আপনি গ্রহণ করুন, যতক্ষণ না আপনি (আমার প্রতি)সন্তুষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ্! আপনার নিকট এমন ঈমান গ্রহণের তাওফিক চাই, যার থেকে এরতাদ হয় না, এবং এমন নিয়ামত দান করুন যা কোনো দিন শেষ হয় না। চিরস্থায়ী জান্নাতের সুউচ্চ কাননে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকার সৌভাগ্য দান করুন।

দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সম্মানিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। আর সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য যিনি সকল জগতসমূহের পালনকর্তা।

লেখক: হুসাইন (আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে, তার সন্তানদের এবং সকল বিশ্বাসীদের ক্ষমা করে দিন, আমীন।)

৪ই রবিউল আওয়াল, ১৪৩৭ হিজরী।